শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলার শেষ অধ্যায়

নির্মলকুমার রায়

করুণা প্রকাশনী। কলকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ—১লা বৈশাখ,
১৩৭২

প্রকাশক
শ্রীবামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলকাতা-১২

মুদ্রাকর
শ্রীঅসিতকুমার ঘোষ
দি মুকুল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৯এ বিধান সরণী
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী
শ্রীনিত্যানন্দ ভকত

উৎসর্গ

সাহিত্যে ও সঙ্গীতে যিনি ছিলেন আমার প্রেরণার উৎস, সেই সাহিত্যিক, কবি, নাট্যকার এবং সঙ্গীতজ্ঞ জ্যেষ্ঠভ্রাতা স্বর্গীয় শ্যামাচরণ রায়ের পুণ্য স্মৃতি পূজায় অর্ঘ্যস্বরূপ এই গ্রন্থটি নিবেদিত হ'ল।

—স্নেহধন্য ভ্রাতা নির্মলকুমার—

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :-

জয়তু নেতাজী

ভারত-আত্মা বিবেকানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংস্পর্শে (মাইকেল মধুসূদন পুরস্কারপ্রাপ্ত)

সঙ্গীতময় শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণমুখে শ্রীচৈতন্যকথা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তীর্থ পরিক্রমা

উপেক্ষিতা জগন্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া

॥ হরি ওঁ রামকৃষ্ণ ॥

নিবেদন

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অহেতুকী কৃপায় "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলার শেষ অধ্যায়" রচিত হ'ল। প্রথমেই শ্রীশ্রীঠাকুরকে কোটী কোটী প্রণাম জানিয়ে, প্রণাম জানাই আমার প্রেমময় দীক্ষাগুরু এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের লোকান্তরিত নবম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজীর উদ্দেশে, যাঁর কৃপায় আমার জীবন আজ ধন্য!

নররূপী ভগবানের লোকোত্তর জীবনের ভাগবতী লীলার শেষ অধ্যায়ের মাধুর্য আস্বাদন করার দুরূহ প্রচেষ্টা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের মাধ্যমে; এই ধৃষ্টতার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করি।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলার শেষ অধ্যায়টি'কে চারটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে; দক্ষিণেশ্বর পর্ব,—যেদিন থেকে তাঁর অন্তলীলার সূচনা, অর্থাৎ পূর্বভাগ; একত্রে বাগবাজার ও শ্যামপুকুর পর্বদ্বয়,—অন্তলীলার মধ্যভাগ, এবং কাশীপুর পর্ব,—অর্থাৎ মহাসমাধি অবধি অন্তলীলার শেষভাগ।

দেহসর্বস্ব সাধারণ মানুষ আমরা; তাই শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহযন্ত্রণার দৃশ্যে আমাদের কাতর হওয়া স্বাভাবিক,—মর্মাহত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু দেহকষ্টের মধ্যেও নরলীলায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে তাঁর মনকে দেহের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে, অনেক উচ্চস্তরে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত পুরুষের ন্যায় অবস্থান করেছেন এবং এইটাই তাঁর ভগবৎ সত্তার বিকাশ। সেই নিত্যশুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল দেহমনকে কেন্দ্র ক'রে প্রকটাবস্থায় তাঁর যে সমগ্র লীলাবিলাস, তারই শেষ অধ্যায়টি তিনি দান করলেন তাঁর অন্তলীলায় 'জগদ্ধিতায়' দেহ বিসর্জনের মাধ্যমে। আমরা যেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই অন্তলীলার দিব্যচিত্রটি অনুধ্যান করে ধন্য হই! এই গ্রন্থ সম্পর্কে এইটাই আমার অন্তরের কথা।

এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীঠাকুরের শেষ লীলাস্থলগুলির চিত্রসমেত সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং স্থানে স্থানে তৎকালীন সংশ্লিষ্ট কতিপয় ভক্তের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পরিবেশিত হয়েছে তাঁর অন্তলীলার পরিপূরক হিসাবে। তাঁর লীলামাহাত্ম্যটিকেও সীমিত অনুভূতিতে যথাসম্ভব প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কীয় আমার অন্যান্য গ্রন্থগুলির ন্যায় এই গ্রন্থটিও যদি ভক্তদের সমাদর লাভ করে, তবে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করব।

আমার পরম সৌভাগ্য যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গপার্ষদ স্বামী অখণ্ডানন্দজীর অকৃতদার মন্ত্রশিষ্য, একাধারে ভক্ত ও বৈজ্ঞানিক এবং বর্তমানে বিবেকানন্দ সোসাইটির সম্পাদক, পরম শ্রদ্ধেয় ডঃ শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নানাভাবে এই বিষয়ে আমায় অনুপ্রেরণা দান করেছেন এবং গ্রন্থটির মূল্যবান ভূমিকা লিখে আমার প্রতি বিশেষ স্নেহানুকূল্য প্রদর্শন করেছেন। তাঁর চরণেও সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই।

বিনীত
নির্মলকুমার রায়

'শ্যামলী'
৩৪/৭-সি, ডি. গুপ্ত লেন
সিঁথি, কলিকাতা-৭০০০৫০

DR. S. B. BANDYOPADHYAY
MSc PhD FTI
Rtd. Director, Jute Technological Research Lab. ICAR) and Emeritus Scientist (ICAR)

7/2C, K. C. GHOSH ROAD,
CALCUTTA-700050

ভূমিকা

দেবমানব ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেড় শতবর্ষ পূর্বে আবির্ভূত হয়ে শতবর্ষ পূর্বে তাঁর জরাজীর্ণ স্থূলশরীর পরিত্যাগ করলেও তিনি সূক্ষ্মভাবে আজও ভক্তহৃদয়ে বর্তমান। ভক্ত তাই চায় তাঁর লীলার বিশেষ বিশেষ দিক বিশেষ বিশেষ সময়ে পুনরালোচনা ক'রে আনন্দলাভ করতে—নতুন কিছু খুঁজতে নয়, পুরাতনেরই রস প্রকৃষ্টভাবে আস্বাদন করতে।

ভক্তের আকাঙ্ক্ষা মেটাতেই ভক্তলেখক শ্রীনির্মলকুমার রায় স্বীয় ভক্তি, বোধশক্তি ও প্রামাণ্যগ্রন্থ অবলম্বনে এই 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলার শেষ অধ্যায়' গ্রন্থখানি রচনা করেছেন। কাহিনীগুলি আলোচনাকালে যে-সব স্ফুট তুলে ধরেছেন, তা সত্যই ভক্তহৃদয়ে লীলামাধুর্য স্ফুরণে সহায়তা করবে।

বহুল প্রচারে এই গ্রন্থ প্রকাশনা সার্থক হোক কামনা করি।

শ্রীশশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কল্পতরু দিবস"

সম্পাদক
বিবেকানন্দ সোসাইটি
১৫১, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৭০০০০৬

সূচীপত্র



পূর্বাভাস

এবার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের বিদায় গ্রহণের পালা,—লীলাবসানের প্রস্তুতি! উপলক্ষ—'ক্যান্সার'। ভগবানের গলায় 'ক্যান্সার', এ-ও এক বিচিত্র লীলা! যুগ-যন্ত্রণা ভোগ করছেন ভগবান; ভক্তের হৃদয়েও তাই 'ক্যান্সার; সুন্দরতম, মধুরতম, মঙ্গলতম, বিশুদ্ধতম, প্রিয়তমের বিয়োগ ব্যথার অশ্রুপ্লাবনের গতিতে তাই লেখনী সিক্ত! অশ্রুস্নাত লেখনীতেই শ্রীভগবানের বিষাদময় সত্যের আবরণ উন্মোচিত হ'লেও, শোক-দুঃখের অতীত সেই অনুপম অমৃত স্পর্শের সঠিক রূপায়ণের জন্য শ্রীভগবানের করুণাভূমিতেই আশ্রয় নিতে হয়। হরিকথা দিয়েই হরিব্যথা জয় করতে হয়; অন্তরের অন্তঃপুরে ভগবানের সর্বশোকাবহ দিব্য ভাস্বর কলেবরের অপরূপ মূর্তি স্থাপনের মাধ্যমে তাঁর শেষ অভিসারের দৃশ্যকে প্রেমধ্যানে জয় করতে হয়!

প্রশ্ন উঠতে পারে যিনি ভগবান, যাঁর কোন অন্ত নেই, তাঁর আবার অন্তলীলা কেন? এ বিষয়ে 'অবতার, ও তাঁর 'লীলা' সম্পর্কে কিছুটা আভাসের প্রয়োজন অপরিহার্য।

শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থাদিতে মূল দশাবতার এবং তার সঙ্গে অন্যান্য অসংখ্য অবতারের উল্লেখ আছে। যুগ প্রয়োজনেই শ্রীভগবানের আগমন; —সনাতন ধর্মরক্ষার জন্যই গীতায় প্রদত্ত—'সম্ভবামি যুগে যুগে'—এই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ভগবানের আগমন নররূপে,—নর নারীর মধ্যে খুব গোপনে। মানুষের আত্মিক উন্নয়নের পথে যখন চরম বিঘ্ন ঘটে, তখন লোকশিক্ষার জন্যই ভগবানকে স্বয়ং অবতরণ করতে হয়।

এবার প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কেবলমাত্র হিন্দুধর্মকে রক্ষার জন্যই কেন বারে বারে ভগবান অবতীর্ণ হন এই ভারতবর্ষে! এই প্রশ্নের উত্তর নানাভাবে বিশ্লেষিত হলেও, একটি সরল উত্তরে বলা যায় যে, হিন্দুধর্মই জগতের আদি ও সনাতন ধর্ম; সনাতন অর্থে চিরস্থায়ী বা নিত্য, এবং সনাতন ধর্ম অর্থে বেদোক্ত ধর্ম। সুতরাং এই ধর্মকে বাদ দিলে, পরবর্তীকালের অন্যান্য ধর্ম বা উপধর্মও বিপন্ন হয়। সেজন্য ইসলাম, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল ধর্মের স্বার্থেই এই বেদোক্ত সনাতন ধর্মকে রক্ষা করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ইসলাম, খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি

সব ধর্মই উদারতায় পূর্ণ ; কিন্তু কিছু ধর্মান্ধ বা অধর্মকারী ব্যক্তিদের বিভ্রান্তিকর কার্যকলাপের ফলে, বা ঐ সব ধর্মের অপপ্রয়োগের দরুণ সনাতন হিন্দুধর্ম যেমন সাময়িক বিপন্ন হয়, তার সঙ্গে অপর ধর্মগুলিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অবতারপুরুষ যখন আসেন, তখন তিনি কেবলমাত্র একটি জাতি, বা ধর্মকে রক্ষার জন্যই আসেন না ; তাঁর আগমনের ফলে, বিশ্বের যাবতীয় ধর্মই রক্ষা পায় এবং নিজ নিজ পথে সফলতার সঙ্গে অগ্রসর হয়। সুতরাং সনাতন ধর্মকে রক্ষা করার অর্থই হ'ল—জগতের সকল ধর্মকে সুপথে চালিত করা। আবার, ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ, যে দেশের মুনি-ঋষিরা ঈশ্বরীয় অনুসন্ধানে এত অগ্রসর, যা পৃথিবীর আর কোথাও ঘটেনি। এই অনুসন্ধানের ফলেই, ভারতীয় মুনি-ঋষিগণ ভগবানের অস্তিত্ব ও অবতাররূপে তাঁর আগমনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ বারে বারে পেয়েছেন এবং এই অনুসন্ধানের ফলশ্রুতি হিসাবেই এই ভারতবর্ষই বারে বারে অবতারপুরুষকে লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। অন্যান্য দেশেও যদি ভারতবর্ষের মত 'আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান' বিষয়ক গবেষণা হত, তবে সে ক্ষেত্রেও তাঁরা নিশ্চয়ই সফলতা অর্জন করতেন। যে মাটিতে চাষ হয়, সেই মাটিতেই ফসল পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, অন্যত্র নয়। ভারতীয় ঋষিগণের অনুসন্ধান বা গবেষণার ফলেই ভারতীয় শাস্ত্রে শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত গীতার সন্ধান পাওয়া গেছে, যা আধ্যাত্মিক জগতের একটি পরিপূর্ণ বিজ্ঞান। 'বিজ্ঞান' কখনই অনুমান-নির্ভর নয়, সম্পূর্ণ প্রমাণ-নির্ভর। আমাদের 'গীতা' সেই প্রমাণভিত্তিক 'আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান'।

অন্যান্য দেশ জড়বিজ্ঞান, বা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চর্চায় রত হওয়ায়, সে সব দেশে আধুনিক বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে—কিন্তু সে তুলনায় ভারতবর্ষ কিছুটা পশ্চাদ্‌পদ। এই সব বৈজ্ঞানিক উন্নতিশীল দেশের সহায়তায় ভারতবর্ষও বর্তমানে ক্রমশঃ এই বিষয়ে উন্নতিকামী। অনুরূপভাবে, ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের সহায়তায় ইদানীংকালে অন্যান্য দেশেও,—এমনকি নাস্তিক্যবাদী দেশেও এই বিষয়ে আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা জগতের পক্ষে একটি শুভ ইঙ্গিত।

যাইহোক, বর্তমানে পুনরায় সনাতন ধর্ম যুগসমস্যায় বিঘ্নিত। এই যুগ সমস্যাটি হ'ল—'মনুষ্যত্বের সঙ্কট' ; 'মনুষ্যত্বের সঙ্কট' অর্থে ধর্মের গ্লানি, সৎ ব্যক্তির ক্রমশঃ অবলুপ্তি ও দুষ্কৃতকারীদের প্রাবল্য। বর্তমানে কলিযুগে এইগুলিই তীব্র সঙ্কট,—এবং মনুষ্যত্বের স্খলনই এই সঙ্কটের প্রধান কারণ। এই সঙ্কটের সঙ্গে যুদ্ধের জন্যই, মানুষের নিজস্ব কল্যাণময়ী শক্তিকে জাগ্রত করার উদ্দেশ্যেই হয় মনুষ্যসমাজের মধ্যে ঈশ্বরের আগমন। মনুষ্যসমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আজ 'ক্যান্সার'

—সত্য-ধর্ম-ন্যায়বিচারের পাতায় পাতায় 'ক্যান্সার'। আশা করব, যুগ-প্রয়োজনে সঠিক সময়ে আবার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় ব্রহ্মশক্তির জাগরণ হবে, যিনি সমগ্র মনুষ্যজাতির সমুদয় গরল নিজ কণ্ঠে ধারণ ক'রে নীলকণ্ঠরূপে রক্ষা করবেন এই অর্বাচীন মনুষ্য সমাজকে; মানুষ আবার পথ খুঁজে পাবে এই আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের সৃষ্টিধর্মী মহান ভাবকে আশ্রয় করে।

নররূপে অবতারের আগমনের ঘটনা পরীক্ষিত সত্য; আমাদের শাস্ত্রে এ সম্পর্কে বহু প্রমাণ প্রদর্শন করা হয়েছে; সুতরাং 'অবতার-তত্ত্বের' বিশদ আলোচনার এখানে কোন প্রয়োজন নেই। অলৌকিক ভাবময় অবতার-তত্ত্ব বোধগম্য করা সাধারণ জীবের পক্ষে কঠিন; কেবলমাত্র উচ্চকোটীর সাধকগণই তা উপলব্ধি করার অধিকারী। শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংক্ষেপে এইটুকু বলা যায় যে, জন্মরহিত, অব্যয় ও প্রাণীগণের ঈশ্বর হয়েও ভগবান মায়াকে আশ্রয় ক'রে ভূতলে অবতীর্ণ হন। এটির তাৎপর্য ভাবমূলক। ঈশ্বরের বিশেষ শক্তি যদি মায়ার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয় এবং এইভাবে স্থূলজগতে আবির্ভূত হয়, তবে তাকেই ভাবরাজ্যে তাঁর অবতরণ বলা হয়। এজন্যই ভগবৎশক্তির আবির্ভাবই 'অবতার' শব্দে অভিহিত হয়। ভগবান যখন সর্বব্যাপী, তখন তাঁর শক্তিও সর্বব্যাপিণী। তাঁর গর্ভে অবস্থিত এই জড়চেতনাত্মক নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে সর্বত্রই তাঁর শক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হয়। এজন্য জগতে যতপ্রকার শক্তি দেখা যায়, সমস্তই তাঁর শক্তি এবং সমস্ত শক্তির আধারভূতা জগদম্বাই তাঁর শক্তিস্বরূপিণী। অধর্মের বিনাশ ও ধর্মের রক্ষার জন্য যে অবতার আবির্ভূত হন, তিনি বিষ্ণুশক্তিরই বিকাশ এবং বিষ্ণুলোক থেকেই অবতারের আবির্ভাব। ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা প্রভৃতি গ্রন্থাদি ছাড়াও ঋগ্বেদ, যজুর্বেদেও এই অবতারের সম্যক্ তত্ত্ব নিরূপণ করা হয়েছে।

আমাদের শাস্ত্রে, মূল দশাবতার এবং তার সঙ্গে অন্যান্য অসংখ্য অবতারের উল্লেখ পাওয়া যায়। দশাবতার সম্পর্কে আমাদের ভক্তিশাস্ত্রে উল্লেখ আছে :—

"মৎস্যঃ কূর্মো বরাহশ্চ নৃসিংহো বামনস্তথা।
রামো রামশ্চ রামশ্চ বুদ্ধঃ কল্কির্দশ স্মৃতা॥"

অর্থাৎ মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ-বলরাম, বুদ্ধ এবং কল্কি—এঁরাই দশাবতার। এ ছাড়াও, শাস্ত্রে অসংখ্য অবতারের কথা বিবৃত হয়েছে। বিষ্ণুশক্তি ছাড়াও অন্যান্য অবতারগণের মধ্যে শৈবপুরাণে অনেক শিবাবতারের বর্ণনা আছে; গণেশ-পুরাণ এবং গাণপত্য তন্ত্রাদিতে অনেক গণপতি-অবতারের বর্ণনা আছে; শক্তিপুরাণ ও শক্তিপ্রধান তন্ত্রসমূহে

অনেক শক্তি অবতারের বর্ণনা আছে ; সূর্যোপাসনা সম্বন্ধীয় বহু গ্রন্থে সূর্যদেবের অনেক অবতারের বিষয়ও বর্ণিত আছে।

এই ভাবে শাস্ত্রে পঞ্চবিধ সগুণ উপাসনার সিদ্ধান্ত অনুসারে বিষ্ণু, শিব, গণপতি, সূর্য এবং দেবী—এই পঞ্চবিধ সকলেরই অবতার হয়, যদিও সর্বকারণ-কারণ জগদীশ্বর ভগবান এক এবং তাঁর অবতারতত্ত্বের রহস্যও এক। কিন্তু যে ভাব নিয়েই অবতার আগমন করুন না কেন, সকলেই সর্বশক্তিমান অদ্বিতীয় সগুণ ব্রহ্মেরই অবতার এবং সকলেই জগৎরক্ষার্থে আগমন করেন ব'লেই পালন-কর্তা বিষ্ণুর অংশ নিয়েই সকলে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন।

অধ্যাত্ম, অধিদৈব এবং অধিভূত—এই তিনকারণেই অবতারের আবির্ভাব হয়ে থাকে। (কারণগুলির সবিশেষ বিশ্লেষণের স্থান এই গ্রন্থে নেই।) শাস্ত্রে আবার অবতার তত্ত্বকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যুগ অনুযায়ী বিশেষ প্রয়োজনে নানারূপে, নানাভাবে ভগবান কখনও পূর্ণ, কখনও আংশিক অবতীর্ণ হয়েছেন। যেখানে কেবলমাত্র তাঁর শক্তির অবতরণ, সেখানে তাঁকে পূর্ণ অবতার বলা হয় না ; কিন্তু যখন তিনি স্বরূপশক্তিতে যোগমায়াবলে নিজে অবতরণ করেন, তখন তিনি পূর্ণ অবতার। ভক্তিশাস্ত্রে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই 'কৃষ্ণস্তু স্বয়ং ভগবান' বলা হয়েছে, যিনি গীতা মুখে আমাদের কাছে প্রকাশ করলেন :—

"যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

অর্থাৎ—'হে ভারত (অর্জুন), যখনই ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি (মায়াবলে) আত্মদেহের সৃষ্টি করিয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হই। সাধুগণের পরিত্রাণ, পাপকারিগণের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে দেহ পরিগ্রহ করিয়া থাকি।'

শ্রীভগবানের এই আত্মপ্রকাশের অভয়বাণী আমরা গীতার যুগেই পেয়েছি—তার পূর্বে নয়, অথচ তার পূর্বেও এই অবতরণের উল্লেখ আমরা বেদেও পেয়েছি। আবার শ্রীভগবানের স্বয়ং প্রকাশ ছাড়াও, মহামায়া ব্রহ্মশক্তিরূপে তাঁর অবতরণের কথাও আমরা পাই মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে।

যথাঃ—"ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্ ॥"

অর্থাৎ—'যখন যখন দানবগণ কর্তৃক উৎপীড়নের সম্ভাবনা দেখা দিবে, সেই সেই সময়ে অরাতি নিধন করিতে আমি অবতীর্ণ হইব।'

সুতরাং এই অবতার তত্ত্বে ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। পূর্ণরূপেই আসুন বা প্রয়োজন বোধে অংশরূপেই আসুন—তিনি সর্বশক্তিমান অবতার।

আবার, গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ষষ্ঠশ্লোকে অবতার-তত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে আছে :—

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥"

অর্থাৎ—'আমি জন্মরহিত, অবিনশ্বর এবং সর্বভূতের ঈশ্বর হইয়াও স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া আত্মমায়ায় আবির্ভূত হই।'

প্রকৃতপক্ষে, ভক্তগণ যাঁকে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপে চিন্তা করেন, তাঁর রূপ যে মায়িক, এটি তাঁরা কল্পনা করতে পারেন না, বা কল্পনা করতে চেষ্টাও করেন না। তাই ভক্তগণ বলেন, এইটিই তাঁর নিত্যরূপ,—বা নিত্যসিদ্ধচিদ্রূপ। যিনি অব্যক্ত, নির্বিশেষ, নির্বিকার,—লীলাবশে তিনিই ব্যক্ত হয়ে সবিশেষ সাকাররূপ ধারণ করেন এবং অবতাররূপে গণ্য হন। অব্যক্ত স্বরূপে যিনি অবতারী, ব্যক্ত স্বরূপে তিনিই অবতার। সেজন্য শ্রীভাগবতে শ্রীকৃষ্ণকে অন্যান্য অবতারের সঙ্গে উল্লেখ ক'রেও পরে বলা হয়েছে—'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং'—অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণ অবতার হলেও 'সব অবতারী' স্বয়ং ঈশ্বর।

কিন্তু কোন অবতারের যখন আবির্ভাব হয়, তখন তাঁকে সহজে চেনা যায় না এবং প্রথমাবস্থায় সাধারণতঃ কেউই তাঁকে ঈশ্বররূপে গ্রহণ করেন না। শ্রীরামচন্দ্র বা শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের সময়েও এই ঘটনা ঘটেছিল। বলা বাহুল্য, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের সময়েও কয়েকজন ছাড়া কেউই তাঁদের প্রথমাবস্থায় চিন্‌তে পারেননি,—পরে অবশ্য পেরেছিলেন। এই সম্পর্কে গীতামুখেই শ্রীভগবান বলেছেন—'নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ।' অর্থাৎ—'আমি সকলের নিকট প্রকাশিত নহি; কারণ, আমি আমার স্বরূপশক্তি যোগমায়া দ্বারা আবৃত থাকি।'

এই সম্পর্কে অবতার পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের 'অবতারতত্ত্ব' বিষয়ক একটি উদাহরণ স্মরণ করা যেতে পারে। ঠাকুর বলছেন,—"নরলীলায় অবতারকে ঠিক মানুষের মত আচরণ করতে হয়,—তাই চিন্‌তে পারা কঠিন। মানুষ হয়েছেন তো ঠিক মানুষ। সেই ক্ষুধা-তৃষ্ণা, রোগ-শোক, কখন-বা ভয়—ঠিক মানুষের মত। রামচন্দ্র সীতার শোকে কাতর হয়েছিলেন। গোপাল নন্দর জুতো মাথায় ক'রে নিয়ে

গিছলেন—পিঁড়ে ব'য়ে নিয়ে গিছলেন। থিয়েটারে সাধু সাজে, সাধুর মত ব্যবহার কর্‌বে,—যে রাজা সেজেছে, তার মত ব্যবহার কর্‌বে না। যা সেজেছে, তাই অভিনয় করবে। একজন বহুরূপী সেজেছে, 'ত্যাগী সাধু'। সাজটি ঠিক হয়েছে দেখে বাবুরা একটি টাকা দিতে গেল। সে নিলেনা, উঁহু ক'রে চ'লে গেল। গা-হাত-পা ধুয়ে যখন সহজবেশে এলো, তখন বল্লে, 'টাকা দাও'। বাবুরা বল্লে, 'এই তুমি টাকা নেবে না ব'লে চ'লে গেলে, আবার টাকা চাইছ?' সে বল্লে, 'তখন সাধু সেজেছি, টাকা নিতে নাই।' তেমনি ঈশ্বর যখন মানুষ হন, ঠিক মানুষের মত ব্যবহার করেন।" (কথামৃত—৪র্থ ভাগ, ৮ম খণ্ড—৩য় পরিচ্ছেদ)

বলা বাহুল্য, ঠাকুরের মত এত সহজভাবে 'অবতারতত্ত্ব' বিষয়ক কোন কথা ইতিপূর্বে কেউ বলেননি।

আমাদের ভক্তিশাস্ত্রে অবতারগণকে নানা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যেমনঃ—পুরুষাবতার, গুণাবতার, লীলাবতার, মন্বন্তরাবতার, আবেশাবতার, অংশাবতার, যুগাবতার, নামাবতার প্রভৃতি। পুরাণে বর্ণিত কয়েকটি অবতারের (নৃসিংহাদি) উদ্দেশ্যই ছিল অসুরনিধন লীলা; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রে একাধারে ঐশ্বর্য ও মাধুর্য লীলায় অসুরনিধনাদি ক্রিয়ার সাথে সাথে ব্রজপ্রেমলীলারও সন্ধান মেলে। কিন্তু পরবর্তীকালে শ্রীবুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণের লীলায় যুগধর্ম অনুযায়ী জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া—এই ত্রিবিধ ব্রহ্মশক্তির ফলস্বরূপ কেবলমাত্র প্রেমধর্মেরই পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীবুদ্ধ থেকে এই প্রেমধর্ম শুরু—অশুভ শক্তিকে প্রেমের মাধ্যমে ধ্বংস করাই যুগধর্ম। এই যুগধর্ম অনুযায়ীই শ্রীচৈতন্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সমগ্র মানবাত্মার মধ্যে দিব্যপ্রেম, পবিত্রতা, জ্ঞান ও শক্তির অনুপ্রেরণা দিয়ে গেছেন এবং সার্বভৌম ভাগবতধর্মের প্রচার দ্বারা জীবকুলকে ভগবানের দিকে আকৃষ্ট ক'রে গেছেন। কিন্তু মনুষ্যদেহ ধারণ ক'রে, নিজেদের স্বরূপশক্তিকে লুক্কায়িত রেখে তাঁদের যা' ক্রিয়াকর্ম, সেগুলিই 'লীলা'রূপে অভিহিত। তাঁদের মধ্যে একাধারে মর্যাদাপুরুষোত্তম সত্তা, অলৌকিক পূর্ণ সত্বা, অতি-মানুষ করুণাময় মহনীয় সত্তা প্রভৃতি সকল অবতারসত্তা বিদ্যমান থাকলেও যুগ প্রয়োজনে যেটুকু প্রয়োজন, সেটুকু ছাড়া অতিরিক্ত কোন অলৌকিক ঘটনায় তাঁরা নিজেদের প্রকাশ করেননি। তাই অবতারগণের লৌকিক জগতে লৌকিক ক্রিয়া আরো কঠিন, আরো রহস্যময়। তাঁদের প্রতিটি ক্রিয়াই 'লীলা'—অথচ সাধারণের বোধগম্য নয়।

'লীলা' শব্দের অর্থ খেলা—এর বেশী সাধারণ মানুষ আর ধারণা করতে পারে না। সৃষ্টির আনন্দ, 'বহু' হবার আনন্দ, আবার তা থেকে নিজেকে লুকিয়ে

রাখার আনন্দ প্রভৃতি ভগবানের আনন্দ-লীলা। আনন্দস্বরূপ ভগবান লীলাচ্ছলে প্রকৃতির আবরণে, কামনা-বাসনার অন্তরালে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন ধরা দেবার জন্যই। জীবকে তিনি আকর্ষণ করছেন ধরা দেবার জন্যই। এই আকর্ষণ, এই লুকোচুরি, এই ছদ্মবেশ—সবই ভগবানের লীলারূপে পরিচিত। এই লীলার মাধ্যমেই যুগধর্ম প্রচার ও লোকশিক্ষার মানসে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের নরদেহে আগমন—যুগাবতাররূপে অবতরণ—সাধারণ মানুষের মত আচার-ব্যবহার—রোগ-যন্ত্রণা ভোগ—আবার স্বধামে প্রত্যাবর্তন। এই বিষয়টি সম্যক্‌রূপে বোধগম্য না হলে, ভগবানের আদি থেকে অন্ত—কোন লীলারই রসাস্বাদন কর্‌তে আমরা সমর্থ হবো না। ভগবানের নরদেহে প্রকটাবস্থায় সমুদয় লীলার সমাপন যজ্ঞকেই অন্তলীলারূপে অভিহিত করা হয়, যদিও কোন অবস্থাতেই তাঁর ভাব-লীলার সমাপ্তি নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলায় 'লোকশিক্ষা'ই ছিল ভগবানের প্রধান উদ্দেশ্য। তাই সমগ্র ভারতবর্ষ সেদিন লুটিয়ে পড়েছিল এই সনাতন ভাবগ্রাহীর পদপ্রান্তে। তৎকালীন সমাজের সকল শ্রেণীর অজস্র নরনারীর সমাবেশ ঘটেছিল চরম সত্যের প্রতীক এই পরম পুরুষের আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের দুর্নিবার আকর্ষণে। লৌকিক জগতে সাধারণ হয়েও যিনি অসাধারণ, সামান্য হয়েও যিনি অসামান্য, নির্ধন হয়েও যিনি ধনী, মূর্খ হয়েও যিনি পণ্ডিত, বস্ত্রযুক্ত হয়েও যিনি বিবস্ত্র, জাগ্রত হয়েও যিনি সমাধিস্থ, গৃহী হয়েও যিনি সন্ন্যাসী, মানব হয়েও যিনি দেবতা, নিঃসন্তান হয়েও যিনি জগৎপিতা—সেই অলৌকিক জগতের মানুষটির কাছে অলৌকিক আকর্ষণেই এসেছিল অগণিত মানুষ; শ্রীভগবানের এটি একটি 'আকর্ষণ লীলা'। রাজা, জমিদার, মনীষী, মহাত্মা, চিন্তাশীল, কবি, ঔপন্যাসিক, চিত্রকর, গায়ক, বাদক থেকে শুরু ক'রে লম্পট, দস্যু, গুণ্ডা, পতিতা, মেথর অবধি সমাজের সকল স্তরের মানুষের ভীড় হয়েছে এই একজন অভিনব মানুষের কাছে এক অমোঘ আকর্ষণে,—যে আকর্ষণ শুধু অনুভবই করা যায়, কিন্তু ব্যক্ত করা যায় না। তাঁর এই আকর্ষণ-মহিমায় সকলের কাছেই ছিল তাঁর দ্বার উন্মুক্ত। তাঁর কাছে যেতে কোন 'গেট-পাশ' লাগত না; তাঁর ভাষণ শোনার জন্য কোন 'টিকিট' লাগত না; তাঁকে কোন 'গুরুদক্ষিণা' দিতে হত না, বা কোন শিষ্যের বাড়িতে কোন 'উপঢৌকন' নিতেও তিনি যেতেন না; আর কোন বিশেষ ভক্তমণ্ডলীর দ্বারাও তিনি সমৃদ্ধ ছিলেন না। তাই তিনি আজও সকলের 'ঠাকুর', সকলের আপনজন, সকলের অন্তরঙ্গ, সকলের পূজিত, সকলের স্মরিত, সকলের ভরসা, সকলের আরাধ্য দেবতা! তিনি এক বিরাট অলৌকিক আকর্ষণ! তাঁর সেই অদ্ভুত আকর্ষণে সবাই মুগ্ধ। অথচ কোন

মাদুলী-কবচ তিনি কাকেও দেন্‌নি ; কারো হাত বা কোষ্ঠী তিনি বিচার করেন নি, —তবু কত লোক এসেছে! অপূর্ব লীলা! এই লীলায় তিনি নিরাকারবাদী কেশব সেনকে সাকারবাদী ভক্তে পরিণত ক'রেছেন ; মাতাল গিরিশ ঘোষকে মহাত্মায় পরিণত করেছেন ; অর্থের জমিদার মথুরা মোহন বিশ্বাসকে পরমার্থের জমিদার ক'রেছেন ; জড়বিজ্ঞান জগতের ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান জগতে টেনে এনেছেন ; সমাজে অনাদৃতা নটী বিনোদিনীকে সাধিকায় পরিবর্তিত করেছেন ; গুরু তোতাপুরীকে নিজের শিষ্যে পরিণত করেছেন ; অল্প-খ্যাত নরেন দত্তকে বিশ্ববিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দে পরিণত ক'রেছেন ; মূর্খ সেবক লেটোকে ব্রহ্মজ্ঞানী লাটু মহারাজে উন্নীত করেছেন ; পত্নী সারদাকে জগন্মাতা সারদা দেবী রূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন ;—এরকম কত লীলাই-না তিনি ক'রেছেন!

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারে কেন এই লীলার প্রয়োজন ছিল? প্রয়োজন ছিল বৈকি! ধর্মের অনন্ত শক্তির উৎস থেকে যখন সমগ্র জাতি বিচ্যুত, সেই শক্তিহীনকে শক্তিসাধনার বেদীমূলে আহ্বান জানাতেই তাঁর এই বিশেষ ধরণের লৌকিক ও অলৌকিক লীলা! কোন বিদ্রোহ নয়, কোন বিপ্লব নয়, কোন রাষ্ট্রীয় আন্দোলন নয়, কোন বিরোধ নয়, কোন বিদ্বেষ নয়, কোন তর্ক নয়, কোন ঘৃণা নয়, কোন যুদ্ধ নয়, কোন ধ্বংস নয় ; শুধু ত্যাগ ও প্রেমের মন্ত্রে শক্তির উদ্বোধন। সংস্কার নয়,—সংস্থাপন ; বিয়োগ নয়,—সংযোগ। আধুনিক ধ্বংসাত্মক সভ্যতার হাত থেকে সমগ্র জাতিকে রক্ষা করার জন্য, ভারতের সনাতন ধর্মকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন অভিনব উপায়ে,—কেবলমাত্র আত্মিকশক্তির সহায়ে। এই বিশ্বের মূলীভূতা চৈতন্যময়ী পরমাশক্তির সন্ধানে আকর্ষণ করলেন সমগ্র জাতিকে। এই আকর্ষণ শক্তিই এবারের লীলার প্রধান শক্তি। যে আকর্ষণ শক্তিতে ভগবান একদা ব্রজলীলায় শুদ্ধাত্মা গোপ-গোপী প্রভৃতির চিত্ত হরণ করেছিলেন, এবারকার শ্রীরামকৃষ্ণ লীলায় তার চেয়ে অনেক বেশী আত্মিক শক্তিতে আকর্ষণ ক'রেছেন সকল স্তরের জীবকে শুদ্ধাত্মা থেকে পাপাত্মা অবধি। তাই স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় তিনি 'অবতার বরিষ্ঠ'! কামারপুকুর থেকে কাশীপুর—সর্বত্রই এই আত্মিক পরমাশক্তির বিকাশ! কোন দল নেই, কোন সংস্থান নেই, কোন বাহবা নেই, কোন সঙ্ঘশক্তি নেই ;—একটি ক্ষুদ্র মানুষ এগিয়ে এলেন তাঁর একক বৃহৎ শক্তিতে, জয় করলেন সমগ্র মানব জাতিকে, আবার অন্তর্হিত হলেন সমগ্র মানবজাতির হলাহল পান ক'রে রুধিরস্নাত কণ্ঠ নিয়ে! সত্যই এ এক অবিশ্বাস্য ঘটনা—বিচিত্র লীলা! স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়—'রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নেই'।

জীবদেহ ধারণ করলে ভগবানেরও রোগ-শোকের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই,—শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। নরলীলায় মানুষের মতই তাঁর কণ্ঠে রোগ এবং সেই উপলক্ষেই তাঁর লীলাবসান—এই কথাটি সর্বদা স্মরণযোগ্য। অবতার জীবনের বিশেষ ঘটনাগুলিই লীলারূপে প্রকাশিত, যদি সেগুলির সঙ্গে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সংযোগ থাকে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ-অন্তলীলার তথ্যাদির সঙ্গে কিছু তত্ত্বমূলক কথা অনিবার্যরূপেই এই গ্রন্থে উপস্থাপিত হয়েছে। অন্তলীলার চিত্রাঙ্কনে সুবিধার জন্য, ঠাকুরের এই বিচিত্র লীলাকে মোটামুটি চারটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে ;—যথা :—দক্ষিণেশ্বর পর্ব, বাগবাজার পর্ব, শ্যামাপুকুর পর্ব এবং কাশীপুর পর্ব।

অবতারপুরুষের লীলার মূল্যায়ন করা সাধারণ জীবের পক্ষে সম্ভব নয়—এই গ্রন্থের তা উদ্দেশ্যও নয়—লেখকেরও সেই স্পর্ধা বা দুঃসাহস নেই। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনতে, বলতে বা লিখতে ভাল লাগে—তাই এই বাণীবদ্ধ ক্ষুদ্র নৈবেদ্য ; কেন ভাল লাগে—জানি না, এর কোন উত্তর নেই।

দক্ষিণেশ্বর পর্ব

শ্রীরামকৃষ্ণ লীলার শেষ অধ্যায় শুরু হয় তাঁর প্রধান লীলাস্থল দক্ষিণেশ্বর থেকেই। ১৮৮৫ সালের মে মাসে শেষবারের মত পানিহাটীতে বৈষ্ণবদের প্রখ্যাত চিঁড়া মহোৎসবে যোগদান উপলক্ষেই তাঁর কণ্ঠে ভয়াবহ রোগের সূচনা —আর লীলাবসান পর্বেরও সূচনা।

[প্রসঙ্গত ঃ উল্লেখ্য, দক্ষিণেশ্বরে যে ঘরটি ঠাকুরের শেষ লীলাস্থল, অর্থাৎ যে ঘরটি থেকে ঠাকুর শেষবারের মত দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করেন, সেই ঘরটি মন্দির প্রাঙ্গনের উত্তর-পশ্চিম কোণে শেষ শিবমন্দিরের ঠিক উত্তরে ; সেখানে ঠাকুর শেষের দিকে প্রায় ১৪ বছর বাস করেছিলেন এবং বর্তমানে সেই ঘরটিই 'শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর' বা 'ঠাকুরের ঘর' নামে ভক্তদের কাছে পরিচিত। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে মাতৃজ্ঞানে ষোড়শী পূজা, ত্যাগী সন্তানদের নিভৃতে শিক্ষাদান, কৃপাদান, জপ-ধ্যান-ভজন-কীর্তন-সমাধি প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণের নানা লীলামুখর স্মৃতিবিজড়িত এই বিশেষ ঘরটি ভক্তদের কাছে তাই বিশেষ প্রিয়। এই ঘরেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবহৃত তক্তাপোষ, চৌকী প্রভৃতি সযত্নে ও পবিত্রভাবে রক্ষিত আছে এবং এখানে নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে। ঠাকুরের জন্মতিথি, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্মতিথি ও ঠাকুরের 'কল্পতরু' উৎসবে এখানে বিশেষ পূজা, হোম ও অন্নভোগ দেবার ব্যবস্থা আছে। এই ঘরের পশ্চিম প্রান্তে দরজার ধারে গঙ্গার দিকে অর্ধচন্দ্রাকৃতি একটি বারান্দা, আর পূর্বদিকে—প্রাঙ্গনে আসার জন্য পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা আর একটি বারান্দা। এই বারান্দার মধ্যবর্তী দেওয়াল দ্বারা বারান্দাটি দু'ভাগে বিভক্ত। দক্ষিণভাগে ঠাকুর ভক্তসঙ্গে ভগবৎ প্রসঙ্গ করতেন—বর্তমানে এই অংশে ঠাকুরের মধ্যম অগ্রজ রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের অন্যতম বংশধর শ্রীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের একটি বই-এর দোকান আছে। এই ঘরের উত্তরে আর একটি চতুষ্কোণ বারান্দা ও তৎসংলগ্ন পূর্ব-পশ্চিমের বারান্দার উত্তরভাগে ঠাকুর কেশবাদি ভক্তগণের সঙ্গে সাধারণতঃ আলাপ আলোচনা করতেন। বর্তমানে এই পবিত্র ঘরটি 'শ্রীরামকৃষ্ণ-তীর্থ' রূপে গণ্য।]

১৮৮৬ সালে দেহরক্ষার বহু পূর্বেই এই দক্ষিণেশ্বরেই ঠাকুর তাঁর লীলা সমাপণের ইঙ্গিত সম্ভবতঃ পেয়েছিলেন। তাই ১৮৮৩ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর



শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর

সন্ধ্যায় দক্ষিণেশ্বরের পবিত্র মাতৃআঙিনায় দণ্ডায়মান অবস্থায় জগন্মাতার কাছে তাঁর প্রার্থনা—"মা, পূজা গেল, জপ গেল, দেখো মা, যেন জড় ক'রো না! সেব্য—সেবকভাবে রেখো। মা, যেন কথা কইতে পারি। যেন তোমার নাম করতে পারি, আর তোমার নামগুণ কীর্তন করবো, গান করবো মা! আর শরীরে একটু বল দাও মা! যেন আপনি একটু চলতে পারি; যেখানে তোমার কথা হচ্ছে, যেখানে তোমার ভক্তরা আছে, সেই সব জায়গায় যেতে পারি।"

(কথামৃত—৫ম ভাগ, ৯ম খণ্ড—১ম পরিচ্ছেদ)

অর্থাৎ, অবতারপুরুষ যখন নরদেহ ধারণ করেন, তখন সাধারণ জীবের মতই প্রার্থনা করেন তাঁর সুরক্ষার জন্য; কিন্তু এই সম্পর্কে প্রকৃতির নিয়মই স্থায়ী। তাই নরদেহে ভক্তরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ যতই প্রার্থনা জানান তাঁর কণ্ঠে গান গাওয়ার জন্য, বা চলচ্ছক্তি বজায় রাখার জন্য, তবু নরদেহে তাঁকে সবকিছুই ভোগ করতে হয়েছে এবং কণ্ঠরুদ্ধ অবস্থায়, চলচ্ছক্তিহীন অবস্থায় এই পৃথিবীর মাটী থেকে তাঁকেও মহাপ্রস্থান করতে হয়েছে। সুতরাং এ সম্পর্কে কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটানোর অবকাশ নেই। সব অবতার পুরুষের জীবনেই এই একই সত্যের প্রকাশ বারে বারে আমরা দেখেছি—এর কোন ব্যতিক্রম হয়নি। পৃথিবীর মাটীতে চিরদিন চিরজীবি হয়ে বাস করার অধিকার বিধাতার বিধানে নেই; তাই ভগবানও যখন জীবদেহে পৃথিবীতে আগমন করেন, তখন একটি নির্দিষ্ট লীলাশেষে তাঁকেও এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়—এটাই অমোঘ সত্য। এখানেও তাই সাধারণ জীবরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সুরক্ষার জন্য জীবের মতই প্রার্থনা জানাচ্ছেন,—আবার ভগবানরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ, ঐ জীবরূপী শ্রীরামকৃষ্ণকে নিত্যলীলায় আকর্ষণ করছেন। আমাদের পক্ষে এই নরদেহধারী পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণের বিশেষ অর্থবহ অভিনয়ের সঠিক অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন; একমাত্র বিশেষ অন্তরঙ্গ পার্ষদগণই এই অভিনয়ের মর্মার্থ বুঝতে সক্ষম।

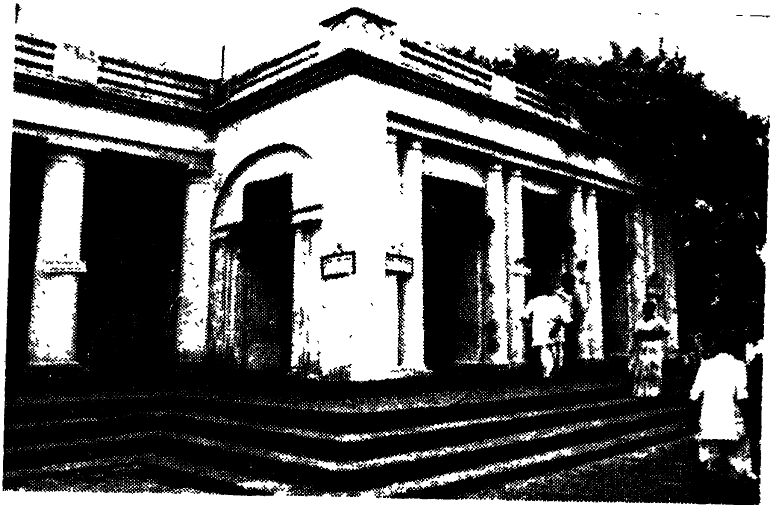
পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ১৮৮৫ সাল থেকেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তলীলার সূচনা। এই সময়ঃ মে-মাস নাগাদ প্রচণ্ড গরমে ঠাকুর যখন শরীরে বিশেষ কষ্টে অস্থির হতেন, তখন ভক্তদের অনুরোধে তিনি বরফ খেয়ে অনেকটা সুস্থ থাকতেন। বরফ খাওয়ার ফলে, সেই প্রচণ্ড গরমে তাঁর দৈহিক কষ্ট কিছুটা লাঘব হতে থাকায়, ভক্তেরা নিয়মিত দক্ষিণেশ্বরে বরফ নিয়ে যাওয়া শুরু করেন; শরবৎ প্রভৃতিতেও ঠাকুর সর্বদা বরফ ব্যবহার করে বালকের মত আনন্দে সেই সময় থাকতেন। কিন্তু এইভাবে ক্রমাগত অতিরিক্ত বরফ খাওয়ার কিছু-দিন বাদেই ঠাকুরের কণ্ঠদেশে একটা ব্যথা অনুভব হয় এবং যত দিন যায়, ততই

সেই ব্যথা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সময় ঠাকুর বেশী কথা বললে, বা সমাধিস্থ হলে, সেই ব্যথা আরো বৃদ্ধি পায় এবং কণ্ঠদেশও কিছুটা স্ফীত হয়। বরফের ঠাণ্ডা ক্রিয়ার ফলে এই অবস্থা অনুমান ক'রে, তাঁর কণ্ঠতালুতে প্রলেপ ও মালিশের ব্যবস্থা হয় এবং ঠাকুরের বেশী কথা বলা ও কোন কারণেই সমাধি অবস্থায় মগ্ন হওয়া নিষেধ ক'রে চিকিৎসক উপদেশও দেন। কিন্তু এই অবস্থাতেই ঠাকুর ১৮৮৫ সালের ২৬শে মে পানিহাটীর মহোৎসবে যোগদান ক'রে এবং ভাবাবেগে নৃত্যগীতে অংশ গ্রহণ ক'রে পুনরায় গুরুতর অসুস্থ হন এবং লৌকিক জগতে শেষ শয্যাগ্রহণ করেন।

এ-ও এক অপূর্ব লীলা! ভগবৎ আকর্ষণে ভক্তের দেহজ্ঞানও থাকেনা— ভক্তরূপী ভগবানের এই লীলায়, সেই ব্রজলীলার গোপীদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যা নিত্য নূতন, আবার নিত্যসত্য।

* * *

যে মহোৎসবের প্রতি ঠাকুরের এত আকর্ষণ এবং যে মহোৎসব উপলক্ষে তাঁর অন্তলীলার সূচনা, সেই মহোৎসব সম্পর্কে জানা যায়, ১৫১৪ সালে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব (আর এক নররূপী ভগবান) একদা পুরী থেকে জলপথে ফেরার সময় কলকাতার কয়েক মাইল উত্তরে, গঙ্গার পূর্বতীরবর্তী পানিহাটীতে নৌকা থেকে অবতরণ ক'রে নিকটস্থ একটি বটবৃক্ষতলে বিশ্রাম করেন। যে ঘাটে তিনি অবতরণ করেছিলেন, তাকে 'গৌরাঙ্গ-ঘাট' বলা হয়। এই পানিহাটীতেই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীরাঘব পণ্ডিতের বাড়ি ছিল। চৈতন্যদেবের শুভাগমনের প্রায় দু'বছর বাদে ১৫১৬ সালে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুও একবার এই পানিহাটীতে শুভাগমন করেন এবং শ্রীরাঘব পণ্ডিতের বাড়িতে কিছুকাল অবস্থান করেন। সেই সময় জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে মহাপ্রভুর অপর আর একজন ভক্ত শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে দর্শন করতে এলে তিনি ভক্ত শ্রীরঘুনাথকে আদেশ করেন দধি-চিঁড়া আহার করাবার জন্য। এই আদেশকেই শ্রীরঘুনাথের প্রতি, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু কর্তৃক 'দণ্ডদান' বলা হয়। সেই আদেশানুসারে সেদিন শ্রীরঘুনাথ প্রচুর পরিমাণে দধি, চিঁড়া, শর্করা, কদলী প্রভৃতি সংগ্রহ করেন এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও অন্যান্য ভক্তদের গঙ্গার তীরে সেই পবিত্র বটবৃক্ষের তলায় ভোজন করিয়ে ধন্য হন। উৎসব শেষে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ভাবাবেশে শ্রীরঘুনাথকে আলিঙ্গন ক'রে বলেছিলেন যে, তিনি যদি সংসার পরিত্যাগ ক'রে নীলাচলে মহাপ্রভুর কাছে গমন করেন, তবে তাঁর ধর্ম-জীবন সম্পূর্ণ করার জন্য মহাপ্রভু তাঁকে সনাতন গোস্বামীর হাতে অর্পণ করবেন।



শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের প্রবেশ পথ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ঐ আদেশে শ্রীরঘুনাথ কিছুকাল পরেই চিরদিনের মত তাঁর পরমাসুন্দরী স্ত্রী ও অতুল বৈভব ত্যাগ ক'রে নীলাচলে গমন করেছিলেন। শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীকৃত পানিহাটীর সেই মহোৎসবের শুভদিনটিকে স্মরণ ক'রে, এরপর থেকেই প্রতিবৎসর জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে বৈষ্ণবগণ কর্তৃক এখানে নাম-সঙ্কীর্তন, পূজা-পাঠ সমেত চিঁড়া মহোৎসবের আয়োজন করা হয়, যাকে 'দণ্ড-মহোৎসব'ও বলা হয়। বর্তমানেও এখানকার সেই প্রখ্যাত উৎসব বজায় আছে।

দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন ১৮৬৮ সাল থেকে বৈষ্ণবভক্তগণের আমন্ত্রণে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এই মহোৎসবে যোগদান শুরু হয়, আর শেষ হয় ১৮৮৫ সালে। মধ্যে অবশ্য কয়েকবছর তাঁর ইংরাজী শিক্ষিত ভক্তগণের আগমনের দরুণ, নানাকারণে তিনি এই উৎসবে যোগদান করতে পারেননি।

১৮৮৫ সালে যখন ঠাকুর তাঁর ভক্তগণসহ এই মহোৎসবে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন তাঁর কণ্ঠদেশে ব্যথার কথা স্মরণ ক'রে, কেউ কেউ তাঁকে এই বিষয়ে নিরস্ত করার চেষ্টা করেন; কিন্তু রামচন্দ্র দত্ত প্রমুখ কিছু ভক্ত ঠাকুরের প্রস্তাবে সম্মত হওয়ায়, ঠাকুর সকল ভক্তকে আশ্বাস দেন যে, তিনি দক্ষিণেশ্বর থেকে সকাল-সকাল কিছু আহার ক'রে পানিহাটীতে গমন করবেন এবং ২/১ ঘণ্টামাত্র থাকার পরেই দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আসবেন; এমন কি, ভাবসমাধি যাতে না হয়, সে বিষয়েও বিশেষ সতর্ক থাকবেন।

এইভাবে, ১৮৮৫ সালের জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে ভক্তগণসহ ঠাকুর নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বর থেকে পানিহাটীর মহোৎসবে বেলা দ্বিপ্রহরে যোগদান করেন। ঠাকুরের জন্য পৃথক নৌকা ছাড়াও আরো দু'খানি নৌকায় ঠাকুরের অনেক ভক্ত সেদিন পানিহাটীতে এসেছিলেন। সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ), বলরাম বসু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রামচন্দ্র দত্ত, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (কথামৃতকার) প্রভৃতি অনেকেই ছিলেন এবং সকলেই অসুস্থ ঠাকুরকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিলেন যে, তিনি যেন কীর্তনানন্দে মত্ত না হন; কারণ, ভাবাবেশ ঘটলে গলদেশে বেদনার বৃদ্ধি হতে পারে।

ঠাকুর সেদিন নৌকা থেকে নেমে প্রথমে ভক্তসঙ্গে শ্রীযুক্ত মণি সেনের বাড়ি, রাধাকান্তের ঠাকুরবাড়ি প্রভৃতি ঘুরে যখন সেখানকার নাটমন্দিরের একপাশে দণ্ডায়মান হন, তখন এক কীর্তনসম্প্রদায়ের নৃত্যগীতে ভাবহীনতা ও প্রাণহীনতা লক্ষ্য ক'রে ঠাকুর অস্বস্তিবোধ করতে থাকেন; তাঁদের মধ্যে জনৈক গোস্বামীর বিসদৃশ বেশভূষা, হাবভাব, ভাবাবেশের ভাণ প্রভৃতি দর্শন ক'রে ঠাকুর ব্যথিত

হন এবং কীর্তনের পবিত্রতা রক্ষার জন্য তিনি স্বয়ং নাটমন্দির থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে এক লম্ফে কীর্তনদলের মধ্যভাগে সহসা অবতীর্ণ হন। কিন্তু অসুস্থ শরীরে এই সময় ভাবাবেশে তাঁর বাহ্যসংজ্ঞা লোপ হওয়ায়, তাঁর ভক্তগণ নাটমন্দির থেকে সঙ্গে সঙ্গে নেমে এসে তাঁকে বেষ্টন ক'রে দাঁড়িয়ে থাকেন। এই সময় ঠাকুর অর্ধবাহ্যদশায় ফিরে সিংহবিক্রমে নৃত্য করতে শুরু করেন এবং মাঝে মাঝে সংজ্ঞা হারিয়ে স্থির হয়ে যেতে থাকেন। ভাবাবেশে নৃত্যকালীন তিনি কীর্তনের দলের সঙ্গে তালে তালে কখনও অগ্রসর হতে থাকেন, আবার কখনও পশ্চাতে ফিরে আসতে থাকেন। এই ঘটনায় ঐ কীর্তন সম্প্রদায় সেই নকলভক্ত গোস্বামীকে পরিত্যাগ ক'রে ঠাকুরকে বেষ্টন ক'রেই শতগুণ উৎসাহে কীর্তনানন্দে মেতে ওঠেন।

এইভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হবার পর, কীর্তনের দল থেকে ঠাকুরকে বিচ্ছিন্ন ক'রে, কিছুদূরে অবস্থিত মহাপ্রভুর লোকান্তরিত পার্ষদ রাঘব পণ্ডিতের বাড়িতে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে ভক্তদের প্রাণে আনন্দদানের পর, ঠাকুরকে নৌকাযোগে পুনরায় রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটা আন্দাজ দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়ে আনা হয়। সেদিন মাঝে মাঝে বৃষ্টি হওয়ায়, ঠাকুরও ভাবাবস্থায় সেই বৃষ্টি ভোগ ক'রেছিলেন।

সেদিন উৎসবস্থলে নানা চরিত্রের লোক ঠাকুরের দেব-অঙ্গ স্পর্শ করার ফলে, সে রাত্রে ঠাকুরের গাত্রদাহ উপস্থিত হয় এবং নিদ্রাও অন্তর্হিত হয়। পানিহাটীর এই উৎসবের পরেই স্নানযাত্রা উপলক্ষে দক্ষিণেশ্বরে প্রচুর ভক্তসমাগম হয় বটে, কিন্তু নানাকারণে ঠাকুরের ভাবের বিঘ্ন ঘটায়, তিনি সেদিন পূর্বের মত কোন আনন্দ উপভোগ করতে পারেননি। এরপর থেকেই ঠাকুরের গলদেশের বেদনা-বৃদ্ধি হয় এবং পুনরায় তাঁকে ডাক্তার দেখানো হয়। পানিহাটী মহোৎসবে বৃষ্টিতে ভেজার ফলে এই বেদনাবৃদ্ধির আশঙ্কায়, ডাক্তার সেই সময় ভক্তগণকে এরূপ ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সে বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক করেন এবং ভক্তগণও সেরূপ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন।

এইভাবে মাসাধিককাল চিকিৎসা করা সত্ত্বেও, ঠাকুরের গলবেদনার কোন উপশম হওয়া দূরে থাক,—একাদশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা প্রভৃতি তিথিতে বরং বেদনার বিশেষ বৃদ্ধি হতে থাকে। সেই সময় কোন কঠিন খাদ্য গলাধঃকরণ করা তাঁর পক্ষে কষ্টকর হতে থাকায়, কেবলমাত্র দুধ-ভাত ও সুজির পায়স আহার ক'রে ঠাকুর অতঃপর দিন অতিবাহিত করতেন।

ডাক্তারেরা ঠাকুরকে ঐ সময় পরীক্ষা ক'রে অভিমত দেন যে, দিবারাত্র ভক্তগণকে ধর্মোপদেশ দেবার জন্য বাগ্‌যন্ত্রের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে,

ঠাকুরের গলদেশে ক্ষত সৃষ্টির উপক্রম হয়েছে এবং সেজন্য বাক্‌সংযম ও সমাধি নিয়ন্ত্রণের বিশেষ প্রয়োজন। এই সময় ডাক্তারগণ ঠাকুরের যথাযথ ঔষধ—পথ্যাদিরও ব্যবস্থা ক'রেছিলেন। কিন্তু প্রতিদিন যে হারে সেই সময় দক্ষিণেশ্বরে ভক্ত সমাগম হ'ত, তাতে তিনি ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ বন্ধ করতে পারেননি, বা আত্মহারা অবস্থায় সমাধি অবস্থাকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। ফলে, আবার ঠাকুরের গলব্যথা বৃদ্ধি হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণলীলায় এই ঘটনায় আমাদের ভক্তিশাস্ত্রের একটি কথা মনে পড়ে যায়। ভক্ত যেমন ভগবানকে লাভ করার জন্য আগ্রহী, ভগবানও তেমন ভক্তসঙ্গ আকাঙ্খা করেন। ভক্ত ছাড়া ভগবানের লীলায় কোন মাধুর্য নেই; তাই নররূপী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেহের এত কষ্টের মধ্যেও সব যন্ত্রণা উপেক্ষা ক'রে ভক্তসঙ্গ অভিলাষী এবং ভক্তদের নিয়েই তাঁর আনন্দের হাট!

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন, ঠাকুরের এই গলরোগ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি দক্ষিণেশ্বরে নানামতের ধর্মসাধনের সময়েও নিজে শরীরের প্রতি কোনদিনই দৃষ্টি দেননি; এমনকি, সাধন শেষেও লোকশিক্ষার জন্য দীর্ঘদিন তিনি যে মাত্রায় পরিশ্রম করেছিলেন এবং ভক্তসমাগমে যে ভাবে তিনি আনন্দচিত্তে নৃত্য-গীতে নিজেকে মত্ত রেখেছিলেন, নরদেহের পক্ষে তা-ও এক অমানুষিক ব্যাপার। এই সম্পর্কে স্বামী সারদানন্দ তাঁর 'লীলা প্রসঙ্গ'—গ্রন্থের একস্থানে উল্লেখ করেছেন :—

"ঠাকুরের নিকটে এখন ধর্মপিপাসু ব্যক্তি সকলের আগমন বড় স্বল্প হইতেছিল না। পুরাতন ভক্ত সকল ভিন্ন, পাঁচ সাত বা ততোধিক নূতন ব্যক্তিকে ধর্মলাভের আশায় দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার দ্বারে এখন নিত্য উপস্থিত হইতে দেখা যাইত। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীযুত কেশবের দক্ষিণেশ্বরে আগমনের কিছু কাল পর হইতে প্রতিদিন ঐরূপ হইতেছিল। সুতরাং লোকশিক্ষা প্রদানের জন্য গত একাদশ বৎসরের নিয়মিত কালে স্নান, আহার এবং বিশ্রামের সত্য সত্যই অনেক সময়ে ব্যাঘাত উপস্থিত হইতেছিল। তদুপরি মহাভাবের প্রেরণায় তাঁহার নিদ্রা স্বল্পই হইত। দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকটে অবস্থান কালে আমরা কতদিন দেখিয়াছি, রাত্রি প্রায় ১১টার সময় শয়ন করিবার অনতিকাল পরেই তিনি উঠিয়া ভাবাবেশে পাদচারণ করিতেছেন—কখনও পশ্চিমের, কখনও উত্তরের দরজা খুলিয়া বাহিরে যাইতেছেন, আবার কখনও-বা শয্যাতে স্থির হইয়া শয়ন করিয়া থাকিলেও সম্পূর্ণ জাগ্রত রহিয়াছেন। ঐরূপে, রাত্রের ভিতর তিন চারি বার শয্যাত্যাগ করিলেও রাত্র ৪টা বাজিবা মাত্র তিনি নিত্য উঠিয়া শ্রীভগবানের স্মরণ, মনন,

নাম-গুণ গান করিতে করিতে উষার আলোকের অপেক্ষা করিতেন এবং পরে আমাদিগকে ডাকিয়া তুলিতেন। অতএব, দিবসে বহু ব্যক্তিকে উপদেশ দিবার অত্যধিক পরিশ্রমে এবং রাত্রের অনিদ্রায় তাঁহার শরীর যে এখন অবসন্ন হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি!"

স্বামী বিবেকানন্দও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দেহরক্ষা ও তার কারণ সম্পর্কে তাঁর 'মাই মাষ্টার' নামক বক্তব্যে পরবর্তীকালে বিদেশে যে বিবরণ প্রকাশ ক'রেছিলেন, তার প্রয়োজনীয় অংশের বঙ্গানুবাদ এখানে উদ্ধৃত করা হল।

যথাঃ—"তাঁর জীবনে কোন বিশ্রাম ছিল না। তাঁর জীবনের প্রথমাংশ কেটেছে আধ্যাত্মিকতা অর্জনে, শেষাংশ ব্যয়িত হয়েছিল তার বিতরণে। দলে দলে লোক আসত তাঁর উপদেশ শুনতে, কোন কোন সময় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২০ ঘণ্টা তিনি তাদের সঙ্গে কথা বলতেন। দু-একদিনের জন্য নয়, মাসের পর মাস এই রকম চলতে লাগল; ফলতঃ কঠোর পরিশ্রমে তাঁর দেহ ভেঙে পড়ল। ক্রমে তাঁর গলায় একটা ঘা হ'ল, অনেক বোঝানো সত্ত্বেও তিনি নিজের সম্পর্কে ছিলেন উদাসীন। আমরা যারা তাঁর কাছে সব সময় থাকতাম, তাঁর কষ্ট লাঘব করার জন্য লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করতে চেষ্টা করলাম; কিন্তু যখনই তিনি শুনতেন, লোকে তাঁর দর্শনপ্রার্থী,—তিনি তাদের কাছে আসতে দেবার জন্য বলতেন, তারা এলে তাদের সব প্রশ্নের উত্তর দিতেন। যদি কেউ বলত, 'তারা কি আপনাকে ক্লান্ত করবে না?'—তিনি হেসে বলতেন, 'এই দেহ ঐরকম শত শত ক্লান্তির বোঝা বহন করেছে। যদি এই দেহ পরের সেবায় ব্যয়িত হয়, তবে তো আমি ধন্য! একটা প্রাণের উপকারে আমি ঐ রকম হাজার হাজার দেহ উৎসর্গ করতে পারি।' একবার একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি তাঁকে বলল, 'মহাশয়, আপনি তো একজন মহান্-যোগী—আপনি আপনার দেহের ওপর মনের প্রভাব বিস্তার ক'রে রোগটা সারিয়ে ফেলুন না।' প্রথমে তিনি কোন উত্তর দিলেন না, বার বার ঐ একই কথা শুনে তিনি নম্রভাবে বললেন, 'বন্ধু, আমি তোমাকে জ্ঞানী ভাবতাম, কিন্তু দেখছি—তুমি একজন সাধারণ মানুষের মতই কথা বলছ। ভগবানের জন্যই এই দেহ উৎসর্গীকৃত। তুমি কি বলতে চাও, আমি আবার তা ফিরিয়ে নেব? এই দেহ বিশ্বের সেবার জন্য উৎসর্গীকৃত।'

"তাই তিনি সকলকে উপদেশ দিতে লাগলেন, চারিদিকে এই সংবাদ প্রচারিত হয়ে গেল যে, তাঁর দেহত্যাগ আসন্ন; তাই আগের চেয়ে আরো বেশী বেশী লোক তাঁর কাছে আসতে শুরু করল। ভারতে এই ধরণের ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের কাছে তাঁর উপদেশ শোনার জন্য লোকেরা কি ভাবে ভীড় করে এবং

জীবৎকালেই তাঁদের ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করে,—তা তোমরা কল্পনাও করতে পার না। হাজার হাজার মানুষ শুধুমাত্র তাঁদের কাপড়ের আঁচলটুকু স্পর্শ করার জন্য প্রতীক্ষা করে। এই ধরণের ধর্মানুরাগ থেকেই সৃষ্টি হয় প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা।···
···নিজের দেহের প্রতি বিন্দুমাত্র নজর না দিয়ে, তিনি উপদেশ দিয়ে যেতে লাগলেন। আমরা তাঁকে বিরত রাখতে পারতাম না। দূর-দূরান্তর থেকে অনেকে আসত, তিনি তাদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বিশ্রাম নিতেন না। তিনি বলতেন, 'যতক্ষণ আমার দেহ সক্ষম থাকবে, ততক্ষণ আমি উপদেশ দেব।' আর তিনি তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন।

"একদিন তিনি আমাদের জানালেন যে, তিনি সেইদিন দেহত্যাগ করবেন এবং পবিত্র বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে তিনি সমাধিস্থ হলেন। এইভাবে সেই মহাপুরুষ আমাদের ত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন।"

(বিবেকানন্দ রচনা সংগ্রহ—২য় খণ্ড—'আমার গুরুদেব')

এখানে স্মরণ করা দরকার যে, স্বামীজী বিদেশীয়গণের কাছে খুব সরলভাবে তাঁর এই বক্তব্যটি রেখেছিলেন সম্ভবতঃ এইজন্যে যে, ঠাকুরের দেহরক্ষার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হৃদয়ঙ্গম করা তৎকালীন বিদেশীয়গণের কাছে কঠিন হত।

যাইহোক, দক্ষিণশ্বরে থাকাকালীন ঠাকুর তাঁর আসন্ন বিদায় গ্রহণের কথা স্মরণ ক'রেই যে তার জন্য নিজে প্রস্তুত হচ্ছিলেন, তার আভাস পাওয়া যায় স্বামী সারদানন্দ রচিত 'লীলাপ্রসঙ্গ'-গ্রন্থের একস্থানে। যথাঃ—"অত্যধিক পরিশ্রমে তাঁহার শরীর যে ক্রমে অবসন্ন হইতেছিল, ঠাকুর তদ্বিষয় আমাদিগের কাহাকে না বলিলেও উহার পরিচয় শ্রীশ্রীজগদম্বার সহিত তাঁহার প্রেমের কলহ আমরা কখনও কখনও শুনিতে পাইতাম, কিন্তু সম্যক্ বুঝিতে পারিতাম না। পীড়িত হইবার কিছুকাল পূর্বে একদিবস দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া আমাদিগের জনৈক দেখিয়াছিল, তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া ছোট তক্তাখানির উপর বসিয়া কাহাকে সম্বোধন করিয়া আপনমনে বলিতেছেন, 'যত সব এঁদো লোককে এখানে আনবি, একসের দুধে একেবারে পাঁচসের জল, ফুঁ দিয়ে জাল ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে আমার চোক্ গেল, হাড় মাটি হ'ল—অত কর্‌তে আমি পারব না, তোর সখ থাকে, তুই কর্‌গে যা! ভাল লোক সব নিয়ে আয়, যাদের দুই এক কথা ব'লে দিলেই (চৈতন্য) হবে!'

"অন্য একদিবসে তিনি সমীপাগত ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন, 'মাকে আজ বলিতেছিলাম—বিজয়, গিরিশ, কেদার, রাম, মাষ্টার এই কয়জনকে একটু একটু শক্তি দে, যাতে নূতন কেহ আসিলে ইহাদের দ্বারা কতকটা তৈয়ারী হইয়া আমার নিকটে আসে।'

"ঐরূপে লোকশিক্ষার সহায়তা প্রদানের বিষয়ে ভক্তিমতী জনৈকা স্ত্রী-ভক্তকে এক সময় বলিয়াছিলেন, 'তুই জল ঢাল্, আমি কাদা করি।'

"ধর্মপিপাসুগণের জনতা দক্ষিণেশ্বরে প্রতিদিন বাড়িতেছে দেখিয়া তাঁহার গলদেশে প্রথম বেদনা অনুভবের কয়েকদিন পরে একদিবস ভাবাবিষ্ট হইয়া তিনি শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে বলিয়াছেন, 'এত লোক কি আন্তে হয়? একেবারে ভিড় লাগিয়ে দিয়েছিস্? লোকের ভিড়ে নাইবার খাবার সময় পাইনা! একটা তো এই ফুটো ঢাক (নিজ শরীর লক্ষ্য করিয়া), রাতদিন এটাকে বাজালে আর কয়দিন টিকবে'?"

সত্যই, অবতারের স্বরূপ সাধারণের কাছে অপরিজ্ঞাতই থাকে। তাই যাঁর জীবন জগন্মাতার নিত্যসঙ্গলাভে সমৃদ্ধ, সেই জগন্মাতার কাছে তাঁর এরূপ অভিমান প্রকাশ স্বাভাবিক হলেও, তাঁর কাছে লোকসংগ্রহ করাটাও এই বিচিত্র লীলার একটি অঙ্গ। ধর্মশক্তি-সঞ্চালনে ঠাকুর যে কেবলমাত্র শ্রীশ্রী মা সারদা দেবী এবং ত্যাগী সন্তানদের শক্তিস্তম্ভরূপে গ'ড়ে তুলেছিলেন, তা নয়; গৃহীভক্তদের মধ্য থেকে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, রামচন্দ্র দত্ত ও মহেন্দ্রনাথ গুপ্তকেও অধ্যাত্ম-উপলব্ধির মাধ্যমে লোকশিক্ষার কাজে নিযুক্ত কর্‌তে আগ্রহী ছিলেন। অর্থাৎ, ত্যাগী ও গৃহী—উভয় শ্রেণীর মিলিত নেতৃত্বে ধর্মজগতে নতুন আলোড়নের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। ত্যাগী ও গৃহী—উভয় ভক্তদের জীবন যে একটি মূল মধুর ঐক্যতান, যার উৎস এবং অবলম্বন—সকল আনন্দের উৎস স্বয়ং সচ্চিদানন্দরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ,—সেই অপূর্ব কথাটি ঠাকুর তাঁর শারীরিক দুর্বলতা উপলক্ষ ক'রে, সমন্বয়ের মূলভাবরূপে প্রকাশ করেন।

দক্ষিণেশ্বর পর্বে অন্যান্য নানা লীলার মধ্যে যেটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, সেটি হ'ল—মহাসমাধিকালের পূর্বলক্ষণাদি সম্পর্কে ঠাকুর কর্তৃক ভক্তদের অবহিত করা। তিনি পরিষ্কার তাঁদের জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, যখন তিনি যার-তার হাতে আহার কর্‌বেন, কলকাতায় রাত্রিবাস কর্‌বেন এবং নিজের খাবারের অগ্রভাগ অপরকে দিয়ে, পরে নিজে গ্রহণ কর্‌বেন—তখনই তিনি এই স্থূল দেহ ত্যাগ কর্‌বেন। তিনি শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীকে আরও একটি লক্ষণ জানিয়ে বলেছিলেন যে, যখন অনেক লোক তাঁকে দেবতা জ্ঞান কর্‌বে, তখন তাঁর অন্তর্ধানের বিলম্ব ঘট্‌বে না। ঠাকুর আরো একটি কথা বলেছিলেন—'যাওয়ার সময় হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়ে যাব'। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর এই ভবিষ্যৎবাণীগুলি দৈববাণীর ন্যায় বাস্তবে পরিণত হবার পরেই তাঁর দেহরক্ষা হয়। অবতারপুরুষের প্রাক্‌অন্তলীলার এটি একটি বৈশিষ্ট্য।

পরবর্তীকালে দেখা যায়, অসুস্থ অবস্থায় ঠাকুর সকলের হাতেই আহার গ্রহণ ক'রেছেন, চিকিৎসার্থে শেষদিকে দীর্ঘদিন (দেহরক্ষার দিন অবধি) কলকাতায় রাত্রিবাস করেছেন এবং ঘটনাচক্রে একদিন নিজের আহারের অগ্রভাগ প্রিয় শিষ্য নরেন্দ্রনাথকে দিয়ে, পরে নিজে আহার করেছেন। আবার, ঠাকুরের অসুখের সময় কয়েকজন ভক্ত একদা দক্ষিণেশ্বরে মিষ্টান্নাদি নিয়ে ঠাকুরকে দর্শন করতে গিয়ে যখন শোনেন যে, ঠাকুর চিকিৎসার জন্য কলকাতায় চলে গিয়েছেন, তখন সেই ভক্তেরা সেখানে তাঁর ফটোর সম্মুখেই সেই মিষ্টান্নভোগ তাঁকে দেবতাজ্ঞানে নিবেদন করে প্রসাদ গ্রহণ করেছিলেন। এই সংবাদ শুনে ঠাকুর পরে অন্যান্য ভক্তদের বলেছিলেন, 'ওরা মা কালীকে ভোগ নিবেদন না ক'রে ছবিকে কেন দিলে?' আর, যাওয়ার সময় 'হাটে হাঁড়ি ভেঙে' সত্যই তিনি তাঁর নিজমুখে আত্মপরিচয় প্রকাশ ক'রে যান—'যে রাম, যে কৃষ্ণ, সে-ই ইদানীং এই দেহে রামকৃষ্ণ।' সুতরাং লীলাবসানের সব কটি পূর্বলক্ষণের বিবরণ পূর্বেই ভক্তদের জ্ঞাত করা—একটি মহাযুগচক্র পরিবর্তনের অপূর্ব ইঙ্গিত এবং এটিও সত্যই তাঁর দৈবলীলার একটি প্রধান বৈশিষ্ট।

দক্ষিণেশ্বর পর্বের আরো অনেক কাহিনী নানা গ্রন্থে দৈবলীলারূপে বিবৃত হলেও, সবগুলির বিস্তারিত আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়। কেবলমাত্র প্রাক্‌-অন্তলীলার প্রধান বিষয়গুলির উপরই এখানে গুরুত্ব দেওয়া হল অতি সংক্ষেপে।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের গলরোগের নিয়মিত চিকিৎসা হলেও, রোগের প্রাবল্য ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং খাওয়া-দাওয়াও প্রায়ই বন্ধ হয়ে যায়। এই সময় ঠাকুরের কণ্ঠতালুদেশ থেকে রক্তক্ষরণ হওয়ায়, ভক্তেরা বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েন। এই সম্পর্কে 'লীলাপ্রসঙ্গ'-গ্রন্থে উল্লেখ আছে—

"নরেন্দ্রনাথ, রাম, গিরিশ, দেবেন্দ্র, মাষ্টার (মহেন্দ্র) প্রভৃতি উপস্থিত সকলে বিশেষ চিন্তিত হইলেন এবং পরামর্শে স্থির হইল, কলিকাতায় একখানি বাড়ি ভাড়া লইয়া অচিরে ঠাকুরকে আনয়নপূর্বক চিকিৎসা করাইতে হইবে।......... নরেন্দ্রনাথকে বিষণ্ণ দেখিয়া জনৈক যুবক কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, যাঁহাকে লইয়া এত আনন্দ, তিনি বুঝি এইবার সরিয়া যান; আমি ডাক্তারী গ্রন্থ পড়িয়া এবং ডাক্তার বন্ধুগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি, ঐরূপ কণ্ঠরোগ ক্রমে ক্যান্সারে পরিণত হয়, অদ্য রক্তপড়ার কথা শুনিয়া রোগ উহাই বলিয়া সন্দেহ হইতেছে; ঐ রোগের ঔষধ এখনও আবিষ্কার হয় নাই।"

অর্থাৎ, ঠাকুরের রোগটি স্বামীজীই সঠিক ধারণা করেছিলেন এবং তার যে

কোন চিকিৎসা নেই, তাও জানতেন। এরপরেই ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বর থেকে স্থানান্তরিত ক'রে সুচিকিৎসার জন্য কলকাতায় নিয়ে আসতে সকল ভক্তই আগ্রহী হন এবং সেইমত ব্যবস্থাদিও হয়। ঠাকুরের পরম ভক্ত ও গৃহীশিষ্য রামচন্দ্র দত্ত তাঁর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবন বৃত্তান্ত'-গ্রন্থে এই বিষয়ে সবিস্তারে যা উল্লেখ ক'রেছেন, তা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। সেই বিস্তারিত বিবরণের একটি অংশ—যথা :—"একদিন অপরাহ্নে আমরা পরমহংসদেবকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছিলাম। তিনি একাকী বসিয়াছিলেন। প্রণাম করিয়া আমরা উপবেশন করিলে, তিনি কহিলেন, 'দেখ, আমি মা'কে কহিতেছিলাম যে, আর আমি লোকের সহিত কথা কহিতে পারিনা। গিরিশ, বিজয়, কেদার, মহেন্দ্র এবং (আর একটি শিষ্যের নাম 'রামচন্দ্র' উল্লেখ করিয়া,) ইহাদিগকে একটু শক্তি দে। ইহারা উপদেশ দিয়া প্রস্তুত করিবে, আমি একবার স্পর্শ করিয়া দিব।' আমরা আশ্চর্য হইয়া রহিলাম। তখন আমরা তাঁহার এ প্রকার কথার তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তিনি যে আমাদের অকূলে নিক্ষেপ করিয়া পলাইবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন, তাহা কে জানিত ?

"ইহার কিছুদিন পরে তিনি গলদেশে বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। প্রথম কয়েকদিন সে বিষয়ে কিছুই মনোযোগ করা হইল না। ক্রমে বেদনা বৃদ্ধি হওয়ায় খাদ্য গলাধঃকরণ করা অতিশয় ক্লেশকর হইয়া পড়িল। কঠিন দ্রব্য আহার করিতে অপারগ হইলেন এবং তরল পদার্থ দ্বারা জীবনরক্ষা করিতে লাগিলেন। এই বেদনা ক্রমে গণ্ডমালায় পরিণত হইল। ইহাদের মধ্যে একটি বিচি স্ফীত ও প্রদাহযুক্ত হইয়া পাকিয়া উঠিল এবং গলনালীতে ফাটিয়া উহা হইতে পূঁজ নির্গত হইতে লাগিল। চিকিৎসার নিমিত্ত প্রথমে ডাক্তার রাখালদাস ঘোষ কিয়দ্দিবস যাতায়াত করিয়াছিলেন। তিনি অকৃতকার্য্য হইলে হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসক ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার দীর্ঘকাল চিকিৎসা করিয়াও বিশেষরূপে উপকার করিতে পারিলেন না। রোগের বৃদ্ধি এবং তাঁহার শারীরিক দৌর্বল্য হওয়ায় ভক্তরা বড়ই চিন্তিত হইলেন। তাঁহার শরীর দুর্বল হইতেছিল, তথাপি কীর্তন করা অথবা উপদেশাদি দেওয়া একদিনও বন্ধ করেন নাই। যে দিন অতিশয় মাতামাতি হইত, সেইদিন রোগের যন্ত্রণাও অত্যন্ত বৃদ্ধি হইত, তজ্জন্য অশেষ প্রকার ক্লেশ পাইতেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাহা ভুলিয়া গিয়া পূর্বের ন্যায় আনন্দ করিতেন।

"যত দিন যাইতে লাগিল, ব্যাধিও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া তাঁহার শরীর একেবারে যারপরনাই অসুস্থ হইয়া আসিল। সময়ে সময়ে এত অধিক পরিমাণে

শোণিতস্রাব হইত যে, পরদিবস অতি ক্লেশে শয্যাত্যাগ করিতেন। কিছুতেই ব্যাধির উপশম না হওয়ায় আমরা কালীপদ, গিরিশ ও দেবেন্দ্রর সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলাম যে, একজন বহুদর্শী ইংরাজ ডাক্তারের দ্বারা ব্যাধি নিরূপণ করা কর্তব্য। এই স্থির করিয়া পরদিবস প্রাতঃকালে আমরা দক্ষিণেশ্বরে গমন করিয়া দেখিলাম যে, পরমহংসদেব অতি বিষণ্ণভাবে একাকী বসিয়া আছেন। সেদিনকার ন্যায় অমন হৃদয়বিদারক ভাব ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায় নাই। আমরা আনন্দময়ের বিরসবদন দেখিয়া চতুর্দিক শূণ্যবোধ করিলাম। কি বলিয়া সম্ভাষণ করিব, ভাবিয়া অস্থির হইলাম। চলিত সামাজিক কথা, 'কেমন আছেন?'—তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বলিতে পারিলাম না। কিন্তু তিনি আপনি কহিলেন, 'গতকল্য প্রায় এক পোয়া রক্ত উঠিয়াছিল'। সে সময়টি শ্রাবণ মাসের শেষ, সর্বদাই বৃষ্টি হইতেছিল এবং গঙ্গার জল বৃদ্ধি হওয়ায় বাগানের উপরেও জল উঠিয়াছিল। তাঁহার একে গলনালীর পীড়া, তাহাতে অমন বর্ষা, একতলা আর্দ্রস্থান তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর জ্ঞান করিয়া আমরা কাতর হইয়া বলিলাম, 'যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে একটি কথা বলি'। তিনি মস্তক নাড়িয়া আদেশ করিলেন। আমরা কহিলাম, 'দিনকতক কলিকাতায় যাইয়া যদি অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে ইংরাজ ডাক্তার দ্বারা আপনার চিকিৎসা করান যায়। এ প্রকারে আর সময় নষ্ট করা উচিত হইতেছে না বলিয়া বোধ হইতেছে।'

"হায়! কি অশুভক্ষণেই সেই কথা আমাদের মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল! আমরা যদি তাহা না বলিতাম, হয়ত তাঁহার দক্ষিণেশ্বর পরিত্যাগ করা হইত না। আমরা অগ্রপশ্চাৎ না বুঝিয়া মনের আবেগে একটা কথা বাহির করিয়া পরিণামে এত যন্ত্রণা, এত মর্মাঘাত পাইতেছি এবং যন্ত্রণা পাইয়াও তাহার বিরাম হইতেছে না। অথবা কি বলিতে কি বলিয়াছি, ইহা তাঁহার ইচ্ছা। তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত তাঁহার আসন পরিবর্তন করা কি একজন ভৃত্যের কর্ম? কখন নহে। এ প্রস্তাবে তিনি মহা আনন্দিত হইয়া বাগবাজার এবং গঙ্গার সন্নিহিত একটি বাড়ি ভাড়া লইবার জন্য আজ্ঞা দিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালকে ডাকাইয়া তখনই পঞ্জিকা দেখিতে বসিলেন। শনিবার বেলা তিনটার পর দিন স্থির হইল। সেদিন বৃহস্পতিবার, সুতরাং মধ্যে একটি দিন রহিল। আমরা তৎক্ষণাৎ তথা হইতে কলিকাতাভিমুখে প্রত্যাগমন করিয়া বাগবাজারের রাজারঘাটের পূর্বগলির ভিতরে একটি নূতন দ্বিতল বাড়ি ভাড়া লইলাম। পরমহংসদেব শনিবার প্রাতঃকালেই কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলেন। তিনি ভাড়াটিয়া বাড়িতে গমন-

পূর্বক কহিয়াছিলেন, 'আমাকে কি এরা গঙ্গাযাত্রা করিয়াছে? এ বাটীতে আমি থাকিতে পারিব না।' কি কারণে তিনি যে এ কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমরা জানি না। তিনি তখনই বলরামবাবুর বাটীতে আসিয়া অবস্থিতি করিলেন।"

উপরোক্ত ঘটনার বিবরণ থেকে ভগবান ও ভক্তমণ্ডলীর তৎকালীন মনোজগতের একটি নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায়। ভক্তগণের আহ্বান যেমন সেদিন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ উপেক্ষা করতে পারেন নি, আবার ভক্তগণের আহ্বানে ভগবান সাড়া দেওয়াতেও ভক্তদের প্রাণে অস্থিরতা প্রকাশেরও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাই ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের খেদোক্তি—'হায়! কি অশুভক্ষণেই সেই কথা আমাদের মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল! আমরা যদি তাহা না বলিতাম, হয়তো তাঁহার দক্ষিণেশ্বর পরিত্যাগ করা হইত না। আমরা অগ্রপশ্চাৎ না বুঝিয়া মনের আবেগে একটা কথা বাহির করিয়া পরিণামে এত যন্ত্রণা, এত মর্মাঘাত পাইতেছি এবং পাইয়াও তাহার বিরাম হইতেছে না।' অবশ্য এটিও 'ঠাকুরের লীলা' বুঝতে পেরেই সঙ্গে সঙ্গে ভক্তের ভেতরে চৈতন্যের উদয়—'কি বলিতে কি বলিয়াছি, ইহা তাঁহার ইচ্ছা। তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত তাঁহার আসন পরিবর্তন করা কি একজন ভৃত্যের কর্ম? কখন নহে।' প্রকৃতপক্ষে, এইটাই এখানে অমৃততত্ত্ব; ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাই বড়।

প্রসঙ্গতঃ বলা আবশ্যক যে, পূর্বে উল্লিখিত স্বামী সারদানন্দ রচিত 'লীলাপ্রসঙ্গ'-গ্রন্থে এবং ভক্তপ্রবর শ্রীরামচন্দ্র দত্ত রচিত 'পরমহংসদেবের জীবন বৃত্তান্ত'-গ্রন্থে লক্ষ্য করা যায় যে, ঠাকুর যে পাঁচজন গৃহীভক্তকে শক্তিসঞ্চারের দ্বারা লোকশিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে পরোক্ষভাবে ঠাকুরের 'চাপরাশ'-ই পেয়েছিলেন। দুটি গ্রন্থেই যে পাঁচজন ভক্তের নাম পাওয়া যায়, তাঁরা হলেন—শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীরামচন্দ্র দত্ত ও শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, যাঁরা ঠাকুরের প্রাক্‌অন্তলীলায় স্বতঃই জড়িত হয়ে প'ড়েছেন আধার অনুসারে। তাই তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এখানে নিবেদিত হ'ল প্রয়োজনবোধে।

প্রথমেই শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্তের সংক্ষিপ্ত প্রসঙ্গে আসি, যিনি ছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ত এবং গৃহীশিষ্যদের মধ্যে বিশেষ অন্তরঙ্গ।

১৮৫৪ সালের ১৪ই জুলাই কলকাতার সিমুলিয়া পল্লীতে শিবনারায়ণ দাস লেনে পিতৃগৃহে তাঁর জন্ম; পরে ঝামাপুকুরে ১৩/২ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের বাড়িটি কিনে তাঁর পিতা সেখানে উঠে আসেন এবং বর্তমানে সেটাই 'কথামৃত-ভবন' নামে পরিচিত।

কৃতী ছাত্র হিসাবে মহেন্দ্রনাথ হেয়ার স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয়; এফ. এ. পরীক্ষায় পঞ্চম এবং প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি. এ. পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়ার আগেই তিনি এক সওদাগরী অফিসে প্রথম চাকরী গ্রহণ করেন এবং পরে শিক্ষকতার কাজে ব্রতী হয়ে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ এবং বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মনেতা আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের ভগ্নী-সম্পর্কীয়া শ্রীমতী নিকুঞ্জ দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর মাতামহ ছিলেন হালিশহরের সুপ্রসিদ্ধ মাতৃসাধক শ্রীরামপ্রসাদ সেনের ভ্রাতার বংশধর।

মহেন্দ্রনাথ প্রথমে আচার্য কেশবচন্দ্রের কাছে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরিচয় জানতে পারলেও, এ বিষয়ে তাঁর খুব আগ্রহ ছিল না। একদা সাংসারিক অশান্তিতে তিনি গৃহত্যাগ ক'রে বরানগরে তাঁর ভগ্নীপতি, শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত কবিরাজ শ্রীঈশানচন্দ্র মজুমদারের বাড়িতে কয়েকদিনের জন্য আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং সেইসময় নিদারুণ মানসিক অশান্তির জন্য তিনি আত্মঘাতী হওয়ার উদ্দেশ্যে মনে মনে বাসনাও পোষণ করেছিলেন। ঠিক এই মানসিক দুর্বলতার সময়েই ১৮৮২ সালে একদিন কয়েকটি বাগানে বেড়াবার কালে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয় এবং তারপর থেকেই তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে যায়। ক্রমাগত ঠাকুরের বিশেষ সান্নিধ্য লাভ ক'রে এবং ঠাকুরের কৃপাবলে তিনি আধ্যাত্মিক জীবনের উচ্চস্তরে উন্নীত হন এবং ঠাকুরকে স্বয়ং ঈশ্বররূপে উপলব্ধি করেন। ঠাকুরের নির্দেশানুসারে তিনি 'গার্হস্থ্য-সন্ন্যাস' গ্রহণ ক'রে সংসারে বাস ক'রেও সংসারের মোহ থেকে মুক্ত ছিলেন এবং নিজে 'শ্রীরামকৃষ্ণময়'রূপে নিয়ত বিরাজ করতেন।

পরম মেধাবী মহেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে গেলেই বা অন্যস্থানেও ভক্তপরিবেষ্টিত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখ নিঃসৃত উপদেশ এবং কথোপকথনগুলি গভীর মনোযোগ সহকারে শুনতেন এবং দিন-লিপিসহ প্রতিদিন নিজের ডাইরীতে সেগুলি লিখে রাখতেন। ঠাকুরের দেহরক্ষার পর তিনি সেই লেখাগুলি বাংলাভাষায় পাঁচটি খণ্ডে বৃহৎ আকারে "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" রচনা ও প্রকাশ করেন। নিজের নাম প্রকাশে অনিচ্ছার জন্য 'কথামৃত' পুস্তকে তিনি নিজের নাম 'শ্রীম' হিসাবে ব্যবহার করেছেন এবং সেখানে নিজের পরিচয় গোপন রেখেছেন। কথামৃত-প্রণয়নই তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি।

১৯৩২ সালের ৪ঠা জুন কলকাতার নিজ বাড়িতে তাঁর দেহত্যাগ হয়।

ঠাকুরের গৃহীসন্তানদের মধ্যে একমাত্র মহেন্দ্রনাথের নশ্বরদেহ কাশীপুর মহাশ্মশানে ঠাকুরের সমাধিমন্দিরের পাশেই আহুতি দেওয়া হয়।

*   *   *

এবার মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় উল্লেখ করছি, যিনি ছিলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রধান পার্ষদ প্রসিদ্ধ অদ্বৈতাচার্যের বংশধর, স্বয়ং বিখ্যাত পণ্ডিত ও ধর্ম-প্রচারক এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চরণাশ্রয়ী।

১৮৪১ সালের ২রা আগষ্ট ঝুলন পূর্ণিমার রাত্রে, নদীয়া জেলার শিকারপুর গ্রামে মাতুলালয়ে তাঁর জন্ম ; পৈতৃক নিবাস শান্তিপুর।

প্রথম জীবনে তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন এবং আচার্যের পদ অলঙ্কৃত করেন ; কিন্তু পরে ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হওয়ায় তিনি 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ' প্রতিষ্ঠা করলেও, পরবর্তীকালে গয়াতে এক যোগীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং সাধন-ভজনে ব্রতী হন।

ব্রাহ্মসমাজে থাকাকালীন কেশবচন্দ্রের অনুসরণে বিজয়কৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হন এবং তাঁর জীবনে অনেক পরিবর্তন ঘটে। ঢাকায় অবস্থানকালে একদিন নিজের ঘরে দরজা বন্ধ অবস্থায় ধ্যান করার সময়, বিজয়কৃষ্ণ সেখানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শন পান ; এর পরেই শ্যামপুকুরে এসে তিনি সর্বসমক্ষে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীচরণে পতিত হন এবং নিজের বক্ষে ঠাকুরের শ্রীচরণ ধারণ করলে ঠাকুর সমাধিস্থ হন। এই সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দেহধারী 'ঈশ্বরাবতার' জ্ঞানে অন্তরে গ্রহণ ক'রে তিনি বলেছিলেন 'বুঝেছি, আপনি কে ! আর বল্‌তে হবে না।'

আমরণ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে অনুপ্রাণিত বিজয়কৃষ্ণের স্বীকৃতিঃ—'দেশ-বিদেশ, পাহাড় পর্বত ঘুরে ফিরে অনেক সাধু-মহাত্মা দেখলাম ; কিন্তু এমনটি আর কোথাও দেখলাম না। এখানে যে ভাবের পূর্ণ প্রকাশ দেখছি, তারই কোথাও দু-আনা, কোথাও এক-আনা কোথাও এক-পাই, কোথাও আধ-পাই মাত্র ; চার-আনাও কোন জায়গায় দেখলাম না।'

ঠাকুরও বিজয়কৃষ্ণকে অত্যন্ত স্নেহ কর্‌তেন ; সব সময় তাঁকে ধর্মোপদেশ দিতেন ; তাঁর সঙ্গে হরিনামে নৃত্য কর্‌তেন এবং সর্বোপরি তাঁকে 'পরমহংসের মত উচ্চ আধার' জ্ঞান কর্‌তেন।

ঠাকুরের প্রভাবে পরবর্তীকালে বিজয়কৃষ্ণ 'ব্রাহ্মধর্ম' ত্যাগ করেন এবং তাঁরই নির্দেশে বৈষ্ণব ধর্মের সাধনায় ব্রতী হয়ে আধ্যাত্মিকতার চরম শীর্ষে উন্নীত হন।

শেষ জীবনে বিজয়কৃষ্ণ পুরীতে সাধন-ভজনে নিযুক্ত ছিলেন এবং ১৮৯৯ সালের ৪ঠা জুন পুরীধামেই দেহরক্ষা করেছিলেন।

*　　　　*　　　　*

এবার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলায় গৃহীভক্তদের মধ্যে বিশিষ্ট লীলা সহায়ক ভক্তভৈরব গিরিশ চন্দ্র ঘোষের সংক্ষিপ্ত প্রসঙ্গ করব, যিনি ছিলেন একাধারে প্রখ্যাত অভিনেতা, নাট্যকার ও কবি।

১৮৪৪ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী, উত্তর কলকাতার বাগবাজারে ১৩ নং বোসপাড়া লেনে গিরিশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। অল্পবয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায়, মাত্র ১৫ বছর বয়সে ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর বিবাহ দেওয়া হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে গিরিশচন্দ্র লেখাপড়া ত্যাগ করেন এবং বাড়িতেই সাহিত্যচর্চা ও ইংরাজী বিদ্যাশেখা শুরু করেন। ক্রমে কুসঙ্গীদের সংস্পর্শে তিনি মদ্যপায়ী ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠেন এবং কয়েকটি অফিসে চাকরী করার পর, অবশেষে প্রথমে সখের ও পরে পেশাদারী থিয়েটারে তিনি অভিনেতারূপে যোগ দেন। এই সময় তিনি নাটক, সঙ্গীত, কবিতা প্রভৃতি রচনায় যথেষ্ট খ্যাতিলাভও করেন।

প্রথম জীবনে গিরিশচন্দ্র সম্পূর্ণ নাস্তিক হলেও, ব্যক্তিগত জীবনে কয়েকটি আঘাত পাওয়ার পর, তাঁর মন বিক্ষিপ্ত হয়। দুটি ভ্রাতা, দুটি ভগ্নী, একটি পুত্র ও অবশেষে স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ায়, তিনি যন্ত্রণা লাঘবের জন্য বেশীমাত্রায় মদ্যপান ও কাব্যচর্চায় ডুবে থাক্‌তেন। এরপর তিনি পুনরায় বিবাহ করেন এবং পূর্ণোদ্যমে থিয়েটারের কাজে যোগ দেন। এই সময় বঙ্গদেশে গিরিশচন্দ্র একাধারে প্রসিদ্ধ কবি, নাট্যকার ও প্রতিভাশালী অভিনেতারূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও, মদ্যপায়ী গিরিশচন্দ্রের ব্যক্তিগত চরিত্রে কোন পরিবর্তন আসেনি। কিন্তু তারপরেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে ও তাঁর কৃপালাভ ক'রে গিরিশচন্দ্রের জীবনে এমন আমূল পরিবর্তন হয় যে, তিনি আধ্যাত্মিকতার উচ্চস্তরে উপনীত হন এবং তাঁর জীবনের সবকিছু ঠাকুরকে 'বকল্‌মা' (সম্পূর্ণ ভার) দিয়ে তিনি ক্রমশঃ দেবচরিত্রে রূপান্তরিত হন।

ঠাকুরকে নিয়ে গিরিশচন্দ্রের জীবনে এমন সব অলৌকিক, অপূর্ব ঘটনা ঘটেছে যা ঠাকুরের আর কোন গৃহী সন্তানের জীবনে ঘটেনি। তাই গিরিশচন্দ্রকে বাদ দিয়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা এবং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে বাদ দিয়ে ভক্ত গিরিশচন্দ্রের জীবন অসম্পূর্ণ থাকে। ভক্তদের মধ্যে অদ্ভুত চরিত্রের গিরিশচন্দ্র ঠাকুরকে কখনো গালিগালাজ ক'রেছেন, আবার পূজার বেদীতে বসিয়ে 'অবতার'-

রূপে অন্তরের শ্রদ্ধাও নিবেদন ক'রেছেন। ঠাকুরও তাঁকে এত স্নেহ কর্‌তেন যে, তাঁর সব অপরাধ ক্ষমা ক'রে, তাঁরই জন্য ত্যাগী সন্ন্যাসীদের মত গেরুয়া বস্ত্র নির্দিষ্ট ক'রেছিলেন। সারাজীবন অনেক রকম গর্হিত কাজ করার পরেও করুণাময় ঠাকুরের অযাচিত করুণা ও পরম আশ্রয় লাভ ক'রে তিনি একদা ঠাকুরকে বলেছিলেন—'তুমি আস্‌বে, আগে জানলে আরো বেশী পাপ কর্‌তাম'। এমনি ছিল তাঁর ঠাকুর সম্পর্কে ধারণা ও বিশ্বাস! তাঁর এই জলন্ত বিশ্বাসের পরিচয় পেয়ে ঠাকুরও বলতেন যে, তাঁর ওপর গিরিশের 'পাঁচ সিকে পাঁচ আনা' বিশ্বাস। ঠাকুর যখন কণ্ঠরোগে আক্রান্ত, তখন তাঁর গলা থেকে পুঁজ-রক্ত ঝরতে থাকায় গিরিশচন্দ্র বলেছিলেন—'এবারে এই সব খেয়ে কীট-পিঁপড়ে অবধি উদ্ধার হয়ে যাবে, তাই শ্রীরামকৃষ্ণ-অবতারে এই রোগ।' কাশীপুরে ঠাকুরের 'কল্পতরু' হওয়ার দিনেও গিরিশচন্দ্র তাঁর বিশেষ কৃপালাভ ক'রেছিলেন এবং সর্বসমক্ষে আন্তরিকভাবে ঠাকুরকে বন্দনা ক'রেছিলেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্ত-ভৈরব গিরিশচন্দ্রের নানা অমৃতপুঞ্জীত কাহিনী সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করলেও একটি পৃথক গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন হয়। শেষজীবনে তিনি 'শ্রীরামকৃষ্ণ জ্ঞানে' লালিত তাঁর একটি পুত্রের অকাল মৃত্যুতে প্রচণ্ড আঘাত পান। ১৯১২ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী গিরিশচন্দ্র কলকাতায় দেহত্যাগ করেন।

* * *

এবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত গৃহী-শিষ্য রামচন্দ্র দত্তের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি।

১৮৫১ সালের ৩০শে অক্টোবর, কলকাতার নারিকেলডাঙ্গায় এক উচ্চ বৈষ্ণব-বংশে রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ঠাকুরের অপর গৃহীভক্ত মনোমোহন মিত্র ছিলেন তাঁর মাসতুতো দাদা এবং স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন তাঁর আত্মীয়। বৈষ্ণব বংশের ধারা অনুযায়ী তিনি ছিলেন আজীবন নিরামিষাসী।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর রামচন্দ্র তদানীন্তন 'ক্যাম্প্‌বেল মেডিক্যাল স্কুল' (বর্তমান নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ) থেকে ডাক্তারী পরীক্ষা পাশ ক'রে গভর্ণমেন্টের অধীনে 'কুইনাইন' বিভাগে সরকারী চাকরী গ্রহণ করেন। পরে রসায়ন শাস্ত্র আয়ত্ত ক'রে তিনি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের মিলিটারী ছাত্রদের অধ্যাপক এবং সহকারী রাসায়নিক-পরীক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি ইংলণ্ডের রাসায়নিক সভার সদস্যও হয়েছিলেন। তিনি আমাশয় রোগের প্রতিষেধক একটি ঔষধও আবিষ্কার করেন এবং নানাভাবে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। চাকরীর প্রথম অবস্থাতেই তিনি বিবাহ করেছিলেন এবং বিজ্ঞানশাস্ত্রে

বেশী মনোনিবেশের ফলে ক্রমশঃ নাস্তিক হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ তাঁর অতি আদরের এক কন্যার মৃত্যুর ফলে তাঁর জীবনে পরিবর্তন আসে এবং তিনি ঈশ্বরের অনুসন্ধানে নানা ধর্মীয় সমাজে যাতায়াত শুরু করেন।

এই সময় ব্রাহ্মসমাজের নেতা আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের প্রবন্ধ পাঠ ক'রে তিনি পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয় জানতে পারেন এবং দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের পূতসঙ্গ লাভ ক'রে তাঁর চরণেই মন-প্রাণ সমর্পণ করেন। ঠাকুর রামচন্দ্রের মস্তকের ব্রহ্মতালুর ওপর নিজ দক্ষিণচরণের বৃদ্ধাঙ্গুলি স্পর্শদ্বারা তাঁকে বিশেষ কৃপা ক'রেছিলেন এবং সাধন-ভজনের জন্য তাঁকে 'শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রীতির' নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম সেবক রামচন্দ্রকে, ঠাকুর অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং রামচন্দ্রও ঠাকুরকে নিজ আরাধ্য দেবতারূপে জ্ঞান করতেন। ঠাকুরের প্রতি তাঁর এত বিশ্বাস ছিল যে, একবার রোগাক্রান্ত অবস্থায় নিজে ডাক্তার হয়েও কোন প্রকার ডাক্তারী ঔষধ না খেয়ে, কেবলমাত্র ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পাদোদক পানের দ্বারা তিনি রোগমুক্ত হয়েছিলেন। কাশীপুরে ঠাকুরের 'কল্পতরু' হওয়ার দিনেও তিনি ঠাকুরের কৃপালাভ করেন এবং ঠাকুরকে 'কল্পতরু'রূপে তিনিই প্রচার করেন। ঠাকুরের ভাবধারা প্রচারের জন্য তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ, বিভিন্ন ধর্মসভায় বক্তৃতা প্রভৃতি শুরু করেন এবং ঠাকুরের অন্তর্ধানের পর তাঁর জীবনী প্রথম প্রকাশ করেন।

ঠাকুরের অনুমতি নিয়ে ১৮৮৩ সালে রামচন্দ্র কলকাতার কাঁকুড়গাছিতে এক নির্জন স্থানে ভক্তদের জন্য একটি সাধন-স্থান প্রতিষ্ঠা করেন এবং ঠাকুরের উপস্থিতিতে ও শ্রীচরণ স্পর্শে ঐস্থান মহাতীর্থে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে ঠাকুরের দেহরক্ষার পর তাঁর নির্দিষ্ট চিতাভস্ম সেখানে সমাহিত ক'রে তার ওপর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দির নির্মিত হয় এবং ঐ স্থানটির নাম 'যোগোদ্যান' রাখা হয়।

১৮৯৯ সালের ১৭ই জানুয়ারী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আজীবন পূজারী রামচন্দ্র 'যোগোদ্যানেই' দেহত্যাগ করেন।

* * *

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত গৃহী-শিষ্য কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দিয়ে, সংশ্লিষ্ট-ভক্ত গণের পরিচিতি অধ্যায়টি শেষ কর্‌ব।

ভক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি ছিল উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার হালিশহর গ্রামে; তিনি সরকারী উচ্চপদে চাকরী কর্‌তেন। প্রথম জীবনে

তিনি ব্রাহ্ম সমাজ, কর্তাভজা, নবরসিক প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে যোগদান করেন এবং অবশেষে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময় ঠাকুর তাঁকে পরম কৃপাদান করে সত্যকারের সাধনপথে আকর্ষণ করেন।

কেদারনাথ 'অবতার' রূপে ঠাকুরকে অন্তরে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর নির্দেশিত সাধন-ভজনে নিজেকে সর্বদা নিযুক্ত রেখেছিলেন। একদা কলকাতায় ভক্ত অধরলাল সেনের বাড়িতে ঠাকুরের সঙ্গে উৎসবে যোগদান ক'রে, কেদারনাথ তাঁর বাড়িতে আহার কর্‌তে আপত্তি জানান; কারণ, কেদারনাথ ব্রাহ্মণ, আর অধরলাল সুবর্ণ বণিক; তাই সামাজিক সংস্কার অনুযায়ী সুবর্ণ বণিকের বাড়িতে ব্রাহ্মণের পক্ষে আহার করা অনুচিত। কিন্তু ভক্তের জাতিভেদ ভুলে যখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং সেখানে প্রসাদ গ্রহণ করেন, তখন কেদারনাথও সামাজিক প্রথার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সেখানে আহার করেন এবং গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখান। ঠাকুরের প্রতি কেদারনাথের অসীম ভক্তি লক্ষ্য ক'রে একদিন নরেন্দ্রনাথকে (স্বামীজীকে) ঠাকুর ব'লেছিলেন কেদারনাথের পায়ের ধুলো নিতে। পরমভক্ত কেদারনাথকে ঠাকুর 'উচ্চথাকের লোক' ব'লে নির্দেশ করেছিলেন।

* * *

দক্ষিণেশ্বর পর্ব শেষ করার আগে, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কণ্ঠরোগকালীন কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন, যার দ্বারা ভগবানের অন্তলীলার সূচনায় তাঁর অন্তরের অমৃতময়পুরুষকে উদ্‌ঘাটিতে করা কিছুটা সহজসাধ্য। সবগুলিই 'কথামৃত'-গ্রন্থে বিবৃত। যথা :—"ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে সকাল ৮টা হইতে বেলা ৩টা পর্যন্ত মৌন অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। আজ মঙ্গলবার ১১ই আগষ্ট ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ, ২৭ শে শ্রাবণ। গতকল্য সোমবার অমাবস্যা গিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের অসুখের সঞ্চার হইয়াছে। তিনি কি জানিতে পারিয়াছেন যে, শীঘ্র তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিবেন? জগন্মাতার ক্রোড়ে আবার গিয়া বসিবেন? তাই কি মৌনাবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন? তিনি কথা কহিতেছেন না দেখিয়া শ্রীশ্রীমা কাঁদিতেছেন। রাখাল ও লাটু কাঁদিতেছেন। ভক্তেরা মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আপনি কি বরাবর চুপ করিয়া থাকিবেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন, 'না'। নারাণ আসিয়াছেন, বেলা ৩টার সময়, ঠাকুর নারায়ণকে বলিতেছেন, 'মা তোর ভাল করবে।' নারাণ আনন্দে

ভক্তদের সংবাদ দিলেন, 'ঠাকুর এইবার কথা কহিয়াছেন।' রাখালাদি ভক্তদের বুক থেকে একখানি পাথর নামিয়া গেল। তাঁহারা সকলে ঠাকুরের কাছে আসিয়া বসিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাখালাদি ভক্তদের প্রতি)—মা দেখিয়ে দিচ্ছিলেন যে, সবই মায়া! তিনি সত্য, আর যা কিছু সব মায়ার ঐশ্বর্য। আর একটি দেখলুম, ভক্তদের কার কতটা হয়েছে।" (কথামৃত-৫ম ভাগ, অষ্টাদশ খণ্ড-১ম পরিচ্ছেদ)

* * *

যথা :—"শ্রীরামকৃষ্ণ দু'একটি ভক্তসঙ্গে ঘরে বসিয়া আছেন। অপরাহ্ন পাঁচটা; বৃহস্পতিবার, ২৭শে আগষ্ট, ১৮৮৫; ১২ই ভাদ্র, শ্রাবণ কৃষ্ণা দ্বিতীয়া।

ঠাকুরের অসুখের সূত্রপাত হইয়াছে। তথাপি ভক্তেরা কেহ আসিলে শরীরকে শরীর জ্ঞান করেন না। হয়তো সমস্ত দিন তাঁহাদের লইয়া কথা কহিতেছেন—কখনও গান করিতেছেন।.........পণ্ডিত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য আসিয়া ঠাকুরকে দর্শন করিলেন। ইঁহার নিবাস আঁটপুর গ্রামে। .... পণ্ডিত আনন্দিত হইয়া যমলার্জ্জুনের এই ভাবের স্তব শ্রীমদ্‌ভাগবত দশম স্কন্দ হইতে আবৃত্তি করিতেছেন।.........ঠাকুর সব শুনিয়া সমাধিস্থ! দাঁড়াইয়াছেন। পণ্ডিত বসিয়া। পণ্ডিতের কোলে ও বক্ষে একটি চরণ রাখিয়া ঠাকুর হাসিতেছেন। পণ্ডিত চরণ ধারণ করিয়া বলিতেছেন, 'গুরো চৈতন্যং দেহি।' ঠাকুর ছোট তক্তার কাছে পূর্বাস্য হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। পণ্ডিত ঘর হইতে চলিয়া গেলে ঠাকুর মাষ্টারকে বলিতেছেন—আমি যা বলি মিলছে? যারা আন্তরিক ধ্যান জপ করেছে, তাদের এখানে আস্‌তেই হবে।" (কথামৃত-৪র্থ ভাগ, পঞ্চবিংশতি খণ্ড—১ম পরিচ্ছেদ)

* * *

যথা :—"ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মধ্যাহ্নে সেবা করিয়া নিজের আসনে বসিয়া আছেন। ডাক্তার ভগবান রুদ্র ও মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন। ঘরে রাখাল, লাটু প্রভৃতি ভক্তেরাও আছেন। আজ বুধবার, নন্দোৎসব, ১৮ই ভাদ্র শ্রাবণ অষ্টমী তিথি; ২রা সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। ঠাকুরের অসুখের সমস্ত ডাক্তার শুনিলেন। ঠাকুর নীচে মেজেতে আসিয়া ডাক্তারের কাছে বসিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—'ত্যাখো গা, ঔষধ সহ্য হয় না! ধাত্‌ আলাদা। আচ্ছা, এটা তোমার কি মনে হয়? টাকা ছুঁলে হাত এঁকে বেঁকে যায়। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়! আর যদি আমি গিরো (গ্রন্থি) বাঁধি, যতক্ষণ না গিরো খোলা হয়, ততক্ষণ নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে থাকবে।' এই বলিয়া একটি টাকা আনিতে বলিলেন। ডাক্তার

দেখিয়া অবাক যে, হাতের উপর টাকা দেওয়াতে হাত বাঁকিয়া গেল ; আর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। টাকাটি স্থানান্তরিত করিবার পর, ক্রমে ক্রমে তিনবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িয়া, তবে হাত পুনর্বার শিথিল হইল।"

(কথামৃত—৪র্থ ভাগ, ষড়বিংশ খণ্ড—৩য় পরিচ্ছেদ)

* * *

যথাঃ—"শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—আচ্ছা, লোকে বলে ইনি যদি এত—(এত সাধু), তবে রোগ হয় কেন ?

……গোস্বামী—আজ্ঞা, আপনার যে অসুখ, সে পরের জন্য ; যারা আপনার কাছে আসে তাদের অপরাধ আপনার নিতে হয়, সেই সকল অপরাধ, পাপ লওয়াতে আপনার অসুখ হয়।

একজন ভক্ত—আপনি যদি মাকে বলেন, মা এই রোগটা সারিয়ে দাও, তা হলে শীঘ্র সেরে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—রোগ সারাবার কথা বল্‌তে পারিনা ; আবার ইদানীং সেব্য-সেবক ভাব কম প'ড়ে যাচ্ছে। একবার বলি, মা, তরবারির খাপটা একটু মেরামত ক'রে দাও। কিন্তু ওরূপ প্রার্থনা কম প'ড়ে যাচ্ছে ; আজকাল 'আমিটা' খুঁজে পাচ্ছিনা। দেখ্‌ছি তিনিই এই খোলটার ভিতরে রয়েছেন।"

(কথামৃত—৫ম ভাগ, অষ্টাদশ খণ্ড—৩য় পরিচ্ছেদ)

* * *

এবার, আর একটি ঘটনার কথা জানিয়ে এই প্রসঙ্গ শেষ করব। পানিহাটীতে যে নৃত্য-গীতের ফলে ঠাকুর নিদারুণ অসুস্থ হন, দক্ষিণেশ্বর পরিত্যাগ করার প্রাক্‌কালীন সেই কীর্তন শোনার লোভ ঠাকুর সংবরণ করতে পারেন নি ; তাই ঐ সময়ে একদিন (২০।৯।১৮৮৫) দক্ষিণেশ্বরে কীর্তনের ব্যবস্থা হলে, সেই কীর্তনের সঙ্গে অত অসুস্থ শরীর নিয়েও তাঁর শেষ নৃত্য করার কথা জানা যায় কথামৃত-গ্রন্থের পঞ্চম ভাগে। যথাঃ—"কীর্তনের জন্য গোস্বামীকে আনা হইয়াছে। একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কীর্তন কি হবে ?' শ্রীরামকৃষ্ণ অসুস্থ, কীর্তন হইলে মত্ততা আসিবে ; এই ভয় সকলে করিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন 'হোক একটু। আমার নাকি ভাব হয়, তাই ভয় হয়। ভাব হলে গলার ঐখানটা গিয়ে লাগে।'

কীর্তন শুনিতে শুনিতে ঠাকুর ভাব সম্বরণ করিতে পারিলেন না ; দাঁড়াইয়া পড়িলেন ও ভক্ত সঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন।"

এখানে বলা আবশ্যক, এইটাই ঠাকুরের জীবনের শেষ নৃত্য।



দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের অন্তলীলার সূচনায় এরকম অনেক কাহিনী প্রামাণিক গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ আছে। সবগুলির উল্লেখ সম্ভব নয়। তবে একটি বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখ ক'রা প্রয়োজন—সেটি হ'ল ঠাকুরের পুনরাগমনের প্রতিশ্রুতি, যা অবতার লীলার স্বধর্মানুবর্তিত্ব ধর্ম।

১৮৮৩ সালের ২৪শে ডিসেম্বর ঠাকুর সুস্থ অবস্থায় দক্ষিণেশ্বরে পূর্বে যেমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—"আর একবার আসতে হবে। তাই পার্ষদদের সব জ্ঞান দিচ্ছি না," (কথামৃত—৪র্থ ভাগ, অষ্টম খণ্ড—২য় পরিচ্ছেদ), তেমনি অসুস্থ অবস্থাতেও দক্ষিণেশ্বরে ১৮৮৫ সালের ৯ই আগষ্ট ঠাকুর আবার তাঁর পুনরাগমনের কথা প্রকাশ ক'রে বলেছিলেন—"যারা অন্তরঙ্গ, তাদের মুক্তি হবে না। বায়ুকোণে আর একবার (আমার) দেহ হবে।"

(কথামৃত—৪র্থ ভাগ, চতুর্বিংশ খণ্ড—২য় পরিচ্ছেদ)।

দক্ষিণেশ্বর পর্বে ঠাকুরের অন্তলীলার সূচনায় তাঁর স্বীয় মুখের এই প্রতিশ্রুতি, গীতায় শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যুগে যুগে অবতার, যুগে যুগে লীলা!

১৮৮৫ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১২৯১ বঙ্গাব্দের ১২ই আশ্বিন, শনিবার সকালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর দক্ষিণেশ্বর লীলা শেষ ক'রে, চিরদিনের মত দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ ক'রে কলকাতায় চ'লে যান।

বাগবাজার পর্ব

দক্ষিণেশ্বর পর্বের শেষে, উত্তরকলকাতার বাগবাজারে শুরু হয় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তলীলার আর এক পর্ব।

পূর্বেই বলা হয়েছে, ১৮৮৫ সালের জুন মাসে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম কণ্ঠদেশে 'ক্যান্সার' রোগে আক্রান্ত হন এবং সেই সময় থেকেই প্রকৃতপক্ষে তাঁর অন্তলীলার সূচনা হয়। সেপ্টেম্বর মাসে ঐ রোগ ভয়াবহ আকার ধারণ করলে, তাঁর সুচিকিৎসার জন্য ভক্তগণ ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বর থেকে কলকাতায় আনা স্থির করেন। ১৮৮৫ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১২৯১ বঙ্গাব্দের ১২ই আশ্বিন শনিবার সকালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বর থেকে উত্তর কলকাতার বাগবাজারে আনা হয়।

প্রথমে বাগবাজারে দুর্গাচরণ মুখার্জি স্ট্রীটে ছোট একটি নতুন দোতলা বাড়ি ভাড়া ক'রে ভক্তগণ ঠাকুরকে নিয়ে সেখানে আসেন, কিন্তু ছোট এই বাড়িতে প্রবেশ ক'রেই মুক্তবায়ুর অভাবদৃষ্টে ঠাকুর সেই বাড়ি পরিত্যাগ ক'রে তৎক্ষণাৎ ভক্তসঙ্গে পদব্রজেই নিকটস্থ রামকান্ত বসু স্ট্রীটে তাঁর প্রিয় গৃহীভক্ত বলরাম বসুর বাড়িতে স্বেচ্ছায় চ'লে আসেন। যতদিন না উপযুক্ত বাড়ি পাওয়া যায়, ততদিন সেখানে অবস্থানের জন্য ভক্ত বলরাম ঠাকুরকে অনুরোধ করায় তিনি সাময়িক-ভাবে সেখানে থাকতে রাজী হন।

ঠাকুরের পরমভক্ত ও গৃহীশিষ্য বাগবাজারনিবাসী এই বলরাম বসু সম্পর্কে কিছু বলা বিশেষ প্রয়োজন; কারণ, ঠাকুরের বাগবাজার-লীলায় বলরাম ছিলেন সকল সময়ের সাথী।

১৮৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে বলরাম বসু উত্তর কলকাতার শ্যামবাজারে প্রসিদ্ধ জমিদার ও পরম বৈষ্ণব মহাত্মা কৃষ্ণরাম বসুর বৈষ্ণব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। উড়িষ্যায় এই বসু-পরিবারের জমিদারী থাকায় স্বভাবতই ধনীর সন্তানরূপে বলরাম পরিচিত হয়েও সরল, নিরভিমানী, বালক-স্বভাব, লোকরঞ্জন মহাপুরুষ ছিলেন। আবার বৈষ্ণব বংশের ধারানুযায়ী সাত্ত্বিক ও নিষ্ঠাবান্ হলেও বলরামের মধ্যে কোন গোঁড়ামীর স্থান ছিল না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তান স্বামী প্রেমানন্দ, তথা বাবুরাম মহারাজের জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী দেবীর সঙ্গে বলরামের বিবাহ হয়।



বলরাম বসুর বাড়ী (বলরাম মন্দির)

উড়িষ্যায় থাকাকালীন লোকমুখে এবং সংবাদ পত্রে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা প্রথম বলরাম জানতে পারেন। পরে তাঁর কলকাতার বাড়ির পুরোহিত বংশীয় ব্রাহ্মণ ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম ভক্ত রামদয়াল চক্রবর্তীর আহ্বানে বলরাম উড়িষ্যা থেকে কলকাতার বাড়িতে চলে আসেন।

তিনি দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে প্রথম ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন এবং তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে মুগ্ধ হন। এরপর থেকেই বলরাম ক্রমাগত দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু করেন এবং দিন দিন ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রূপে পরিগণিত হন। ঠাকুরের মিষ্ট ব্যবহার এবং পুনঃ পুনঃ ভাবসমাধির পরিচয় পেয়ে তিনি ঠাকুরকে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যরূপেই নিজের অন্তরে গ্রহণ করেন; সেজন্য ঠাকুরকে দর্শন-মাত্রই তিনি মস্তক লুটিয়ে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করতেন।

ঠাকুরের কাছ থেকে বিশেষ কৃপালাভের পর বলরামের জীবনে আধ্যাত্মিক-ভাবের প্রসার ঘটে এবং তিনি নির্লিপ্তভাবে সংসারে অবস্থান করতে থাকেন। ঠাকুরের প্রতি গভীর অনুরাগ এবং তাঁর কাছে শিষ্যের মত আচরণে, বলরামের বৈষ্ণব-আত্মীয়বর্গ বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং তাঁকে প্রথম প্রথম এই কাজে বাধা দেবার চেষ্টাও করেন; কিন্তু ঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত বলরাম, ঠাকুরের কৃপায় সকল বাধা উপেক্ষা করায় তাঁরা পরাভূত হন ও ক্রমে ক্রমে তাঁরাও ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে, পরবর্তীকালে সবাই ঠাকুরের ভক্তে পরিণত হন এবং তাঁদের সংসার প্রকৃতপক্ষে 'ঠাকুরের সংসার'রূপে গণ্য হয়। বলরাম নিজেকে ঠাকুরের সেবায় সম্পূর্ণ উৎসর্গ ক'রেছিলেন। ঠাকুরের দেহরক্ষার দিন অবধি তাঁর প্রয়োজনীয় আহার্যের প্রায় সমস্ত কিছুই বলরাম সরবরাহ করতেন এবং বলরামের এই অকুণ্ঠ সেবার জন্য ঠাকুর তাঁকে অন্যতম 'রসদদার' হিসাবে গণ্য করতেন।

এহেন পরমভক্ত ও পরম সেবক বলরামের উপর ঠাকুর স্বভাবতই অনেক বিষয়ে জোর খাটাতেন, যেমন জোর ক'রে শেষ সময়ে ঠাকুর তাঁর বাড়িতে চ'লে এসেছিলেন। অবশ্য বলরাম-ভবনে ঠাকুরের বেশীদিন অবস্থান হয়নি, কারণ ভক্তদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় মাত্র সাতদিনের মধ্যেই বাগবাজারের পার্শ্ববর্তী শ্যামপুকুর অঞ্চলে একটি বাড়ি ভাড়া পাওয়ায়, ভক্তগণ একসপ্তাহ বাদেই সেখানে ঠাকুরকে স্থানান্তরিত করেছিলেন।

বসু-ভবনে ঠাকুরের শুভাগমনের সাথে সাথেই ভক্তগণ যেমন পৃথক বাড়ির জন্য অনুসন্ধানে ব্যস্ত ছিলেন, ঠাকুরের চিকিৎসার যাতে ইতিমধ্যে ব্যাঘাত না ঘটে, সে বিষয়েও সজাগ ছিলেন এবং কলকাতার তৎকালীন নামী চিকিৎসকগণ কর্তৃক তাঁর উপযুক্ত চিকিৎসারও ব্যবস্থা করেছিলেন। এই সম্পর্কে স্বামী সারদানন্দ

তাঁর 'লীলাপ্রসঙ্গ'-গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—"বৃথা সময় নষ্ট করা বিধেয় নহে ভাবিয়া ভক্তগণ ইতিমধ্যে একদিবস কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্যগণকে আনয়ন করিয়া ঠাকুরের ব্যাধি সম্বন্ধে মতামত গ্রহণ করিলেন। গঙ্গাপ্রসাদ, গোপীমোহন, দ্বারিকানাথ, নবগোপাল প্রভৃতি অনেকগুলি কবিরাজ সেদিন আহূত হইয়া ঠাকুরকে পরীক্ষা করিলেন এবং তাঁহার 'রোহিণী' নামক দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি হইয়াছে বলিয়া স্থির করিলেন। যাইবারকালে একান্তে জিজ্ঞাসিত হইয়া গঙ্গাপ্রসাদ জনৈক ভক্তকে বলিলেন, 'ডাক্তারেরা যাহাকে ক্যান্সার বলে রোহিণী তাহাই ; শাস্ত্রে উহার চিকিৎসার বিধান থাকিলেও উহা অসাধ্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।' কবিরাজদিগের নিকটে বিশেষ কোন আশা না পাইয়া এবং অধিক ঔষধ ব্যবহার ঠাকুরের ধাতুতে কোনকালে সহে না জানিয়া, ভক্তগণ তাঁহার হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করানোই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন।"

ঠাকুর অল্প কয়েকদিন বলরাম বসুর বাড়িতে বাস করলেও, তাঁর একদিনও বিশ্রাম ছিল না। চিকিৎসার জন্য কলকাতায় ঠাকুরের আগমন ও অবস্থানের কথা চারিদিকে প্রচার হওয়ায়, এই সময় দলে দলে ভক্তরা তাঁর কাছে আসতে থাকেন এবং তিনিও তাঁদের যথাসাধ্য কৃপা করেন। যেখানে ভগবান, সেখানেই ভক্ত,—আবার যেখানে ভক্ত, সেখানেই ভগবান! ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অবতার-লীলায় এই দলে দলে ভক্তসমাগম অভিনব, অভাবণীয়! সবকটি 'ভক্ত-নদী' এসে মিলিত হচ্ছে 'ভগবান-সমুদ্রে!' ভগবানের সঙ্গ-সুখে যে দিব্যানন্দ, তাতেই মগ্ন হয়ে আছে ভক্তদল ; তাই ঠাকুরের শারীরিক অসুস্থতার কথা ভুলে, শুধুমাত্র সেই 'ভাব-মুখর' ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়েই তাদের 'ভাব-মুখর' আনন্দের হাট, তাঁর অনৈশ্বর্যই ভক্তদের ঐশ্বর্য!

বসু-ভবনে এই সময় দলে দলে ভক্ত সমাগম ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক কৃপা বিতরণের একটি সুন্দর চিত্র স্বামী সারদানন্দের 'লীলাপ্রসঙ্গ'-গ্রন্থে পাওয়া যায়, যা অনুধ্যানের যোগ্য। যথা :—"এদিকে চিকিৎসার্থ ঠাকুরের কলিকাতা আগমন শহরের সর্বত্র লোকমুখে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল এবং পরিচিত অপরিচিত বহু ব্যক্তি তাঁহার দর্শনমানসে যখন-তখন দলে দলে উপস্থিত হইয়া বলরামের ভবনকে উৎসব-স্থলের ন্যায় আনন্দময় করিয়া তুলিল। ডাক্তারের নিষেধ ও ভক্তগণের সকরুণ প্রার্থনায় সময়ে সময়ে নীরব থাকিলেও ঠাকুর যেরূপ উৎসাহে তাহাদিগের সহিত ধর্মালাপে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহাতে বোধ হইল তিনি যেন ঐ উদ্দেশ্যেই এখানে আগমন করিয়াছেন, যেন দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত যাওয়া যাহাদের পক্ষে সুগম নহে, তাহাদিগকে ধর্মালোকপ্রদানের জন্যই তিনি কিছুকালের জন্য তাহাদের দ্বারে

উপস্থিত হইয়াছেন! প্রাতঃকাল হইতে ভোজনকাল পর্যন্ত, এবং ভোজনান্তে ঘণ্টা দুই আন্দাজ বিশ্রামের পরেই রাত্রির আহার এবং শয়নকাল পর্যন্ত প্রতিদিন তিনি ঐ সপ্তাহকাল মধ্যে বহুলোকের ব্যক্তিগত জীবনের জটিল প্রশ্নসকল সমাধান করিয়া দিয়াছেন ; নানাভাবে ঈশ্বরীয় কথার আলোচনায় বহু ব্যক্তিকে আধ্যাত্মিক পথে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন এবং ভজন-সঙ্গীতাদি শ্রবণে গভীর সমাধি-রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বহু পিপাসুর প্রাণ শান্তি ও আনন্দের প্লাবনে পূর্ণ ও উচ্ছলিত করিয়াছিলেন। সকল সময়ে উপস্থিত থাকিবার সৌভাগ্য আমাদিগের কাহারও ঘটে নাই, গৃহস্বামীকেও ঠাকুরের এবং ভক্তগণের সম্বন্ধে নানা বন্দোবস্ত করিতে অনেক সময়ে স্থানান্তরে ব্যস্ত থাকিতে হইত, সুতরাং ঐ সপ্তাহের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। অতএব কিভাবে ঠাকুর বলরামের ভবনে এই কয়দিন যাপন করিয়াছিলেন, তাহা পাঠককে বুঝাইবার জন্য নিম্নে একটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমরা নিরস্ত হইব।

"আমরা তখন কলেজে পড়িতাম, সুতরাং সপ্তাহের মধ্যে দুই-এক দিন মাত্র ঠাকুরকে দেখিতে আসিবার অবসর পাইতাম। একদিবস অপরাহ্নে ঐরূপে বলরামের ভবনে আসিয়া দেখি, দ্বিতলের বৃহৎ ঘরখানি লোকে পূর্ণ ও গিরিশচন্দ্র এবং কালীপদ মহোৎসাহে গান ধরিয়াছে,

'আমায় ধরো নিতাই
আমার প্রাণ যেন আজ করে রে কেমন।'

গৃহমধ্যে কোনরূপে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, ঘরের পশ্চিমপ্রান্তে পূর্বমুখে উপবিষ্ট থাকিয়া ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন। তাঁহার মুখে প্রসন্নতা ও আনন্দের অপূর্ব হাসি, দক্ষিণচরণ উত্থিত ও প্রসারিত এবং সম্মুখে উপবেশন করিয়া একব্যক্তি পরম প্রেমের সহিত ঐ চরণখানি অতি সন্তর্পণে বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ঠাকুরের পদপ্রান্তে যে ঐরূপে উপবিষ্ট রহিয়াছে, তাহার চক্ষু নিমীলিত এবং মুখ ও বক্ষ নয়নধারায় সিক্ত হইতেছে। গৃহ নিস্তব্ধ এবং একটা দিব্যাবেশে জমজম করিতেছে। গান চলিতে লাগিল—

'আমার প্রাণ যেন আজ করে রে কেমন,
আমায় ধরো নিতাই।
(নিতাই) জীবকে হরিনাম বিলাতে,
উঠ্‌ল যে ঢেউ প্রেমনদীতে,
সেই তরঙ্গে এখন আমি ভাসিয়ে যাই।
(নিতাই) খত্‌ লিখেছি আপন হাতে,

অষ্ট সখী সাক্ষী তাতে,

(এখন) কি দিয়ে শুধিব আমি প্রেমের মহাজন ॥

(আমার) সঞ্চিত ধন ফুরাইল,

তবু ঋণের শোধ না হ'ল,

প্রেমে দায়ে এখন আমি বিকাইয়ে যাই ।'

"গীত সাঙ্গ হইলে, কতক্ষণ পরে ঠাকুর অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া সম্মুখস্থ ব্যক্তিকে বলিলেন, 'বল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—বল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—বল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।' ঐরূপে উপর্যুপরি তিনবার তাহাকে ঐ নাম উচ্চারণ করাইবার কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইয়া অন্যের সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া পরে আমরা জানিতে পারিয়াছিলাম, ঐ ব্যক্তির নাম নৃত্যগোপাল গোস্বামী, ঢাকায় কোন কলেজে তিনি অধ্যয়ন করাইয়া থাকেন, ঠাকুরের পীড়ার কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। গোস্বামী যেমন ভক্তিমান, দেখিতে তেমনি সুপুরুষ ছিলেন।"

উক্ত ঘটনায় লক্ষ্য করা যায়, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন ভগবান শ্রীচৈতন্যের ভাবে বিরাজ করছিলেন। যে বাড়ির সবাই বৈষ্ণব, যে বাড়িতে জগন্নাথদেবের বিগ্রহে নিত্যপূজা হয়, সেখানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় অবতার পুরুষের, তাঁর পূর্ববর্তী অবতারের ভাবে ভাবাবিষ্ট হওয়া স্বাভাবিক ; তাই, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভাবের অভাবনীয় ক্রিয়ায় ভক্তের সম্মুখে তিনি সেদিন 'শ্রীচৈতন্য ভাবেই' দর্শন দেন এবং ভক্তের মুখ দিয়েই 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'—এই মহানামের শক্তিকে স্বীকার করিয়ে নেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-অবতার লীলায় এটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ যে অভিন্ন, এই গূঢ় তত্ত্বটি এখানে প্রমাণিত। একই ঈশ্বর—একবার শ্রীচৈতন্যরূপে, আর একবার শ্রীরামকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত যুগ-প্রয়োজনে। কিন্তু উভয়ে ভিন্নরূপে এসেছিলেন যুগের পার্থক্য অনুযায়ী। তাই উভয়ের জীবনধারার মধ্যে বহুলাংশে যেমন সাদৃশ্য ছিল, অল্পাংশে তেমন বৈসাদৃশ্যও ছিল। প্রকৃতপক্ষে জীবের কল্যাণের জন্য ভিন্নভাবে, ভিন্নদেহে তাঁরা নরলীলা সম্পাদন করেছেন, কিন্তু উভয়ের মধ্যে মূলতঃ কোন ভেদ ছিল না। এ যেন একই সঙ্গীত বিভিন্ন সুরে গাওয়া,—ভাষা এবং ভাব একই, কেবল সুরটি ভিন্ন। যে গান প্রভাতে 'ভৈরবী' সুরে গাওয়া, সেই গান সন্ধ্যায় 'পূরবী' সুরে গাওয়া। সময়ের ব্যবধানে ও পরিবর্তনে একই গানের সুর পরিবর্তিত হয় সময়োপযোগী করার জন্য ; তা না হলে শ্রোতার মন ভরে না, শ্রোতা গ্রহণ করে না। তাই শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের ভক্তদের চাহিদা অনুযায়ীই লীলা ক'রে গেছেন। গানের কথাগুলি একই

সুরটি ভিন্ন, কিন্তু উদ্দেশ্য অভিন্ন। বাগবাজার-লীলায় দুই অবতারের অভেদ তত্ত্বটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়—ভগবান যেমন এক, ভক্তও জাতি হিসাবেই এক, ভক্তদের মধ্যে ভেদাভেদ বাঞ্ছনীয় নয়।

* * *

যাইহোক, কণ্ঠে 'ক্যান্সার' অসুখে আক্রান্ত হয়ে শেষবারের মত ভক্ত বলরাম বসুর যে বাড়িতে মাত্র সাতদিন নানা লীলা বিলাসের মধ্যে ঠাকুর অবস্থান ক'রে-ছিলেন, সেই চিরপবিত্র বাড়িটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে বাগবাজার-পর্বের কাহিনী শেষ করব।

ঠাকুরের অন্তলীলার মাধুর্যে পরিপূর্ণ বসু-ভবনে স্বল্পদিন ঠাকুর অবস্থান করলেও, ইতিপূর্বে শতাধিকবার তিনি এই বাড়িতে শুভাগমন ও মাঝে মাঝে অবস্থান ক'রে বহু লীলা প্রকাশ করেছিলেন। তাই পরবর্তীকালে এই বাড়িটিকে 'বলরাম-মন্দির' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

বিভিন্ন সময়ে এই বাড়িতে ঠাকুরের উপস্থিতি, ভক্তসঙ্গে মিলন, রাত্রিবাস, অন্ন-গ্রহণ, রথটানা, হরি সঙ্কীর্তন, ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ, মুহুর্মুহু সমাধি প্রভৃতি বহু প্রকারের লীলা এই বাড়িতেই সম্পন্ন হয়েছিল এবং ঠাকুর এই বাড়িটিকে তাঁর অন্যতম 'কেল্লা' ব'লে মনে করতেন। ঠাকুরের শতাধিকবার শুভাগমন ছাড়াও, এই বাড়িতে শ্রীশ্রীমাসারদা দেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ প্রমুখ পার্ষদগণের বিভিন্ন সময়ে অবস্থান এবং পরবর্তী-কালে এই বাড়িতেই স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দের (বলরামের শ্যালক) দেহরক্ষা প্রভৃতি স্মৃতিতে বাড়িটি ঠাকুরের অনুরাগীদের কাছে পবিত্র সম্পদরূপে গণ্য।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ঠাকুরের দেহরক্ষার পর এই বাড়িতেই ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তেরা প্রথমে ঠাকুরের ভস্মাধার ও ব্যবহৃত জিনিসগুলি কাশীপুর উদ্যানবাটী থেকে এনে রক্ষা করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক বিশ্ববিখ্যাত 'রামকৃষ্ণ মিশন' ১৮৯৭ সালের ১লা মে, এই বাড়িতেই প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়। এই বাড়িতেই পরম ভাগ্যবান বলরামও ১৮৯০ সালে দেহরক্ষা করেন। এই বাড়ির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে, দক্ষিণেশ্বরের ন্যায় এই বাড়িতেও ঠাকুর তাঁর পুনরাবির্ভাবের প্রতিশ্রুতি একদা ভক্তদের দান করেছিলেন। ১৮৮৫ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর বলরাম ভবনে ঠাকুরের শেষ আগমনের পূর্বে, ১৩ই জুলাই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে ঠাকুর যখন এই বাড়িতে এসেছিলেন, তখন তাঁর পুনরাবির্ভাবের বিষয়ে ভক্তদের কাছে রহস্যচ্ছলে যে ইঙ্গিত করেছিলেন, সে সম্পর্কে কথামৃতকার মাষ্টারমশাই লিখেছেন :—

"শ্রীরামকৃষ্ণ·········বাসনা থাকলেই শরীর ধারণ।

একজন ভক্ত—যাঁরা অবতার দেহধারণ ক'রে এসেছেন, তাঁদের কি বাসনা?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—দেখেছি, আমার সব বাসনা যায় নাই। এক সাধুর আলোয়ান দেখে বাসনা হয়েছিল, ঐ রকম পরি। এখনও আছে। জানি কিনা আর একবার আসতে হবে।

বলরাম (সহাস্যে)—আপনার জন্ম কি আলোয়ানের জন্য? (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—একটা সৎ কামনা রাখতে হয়। ঐ চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ হবে ব'লে। সাধুরা চার ধামের এক ধাম বাকী রাখে। অনেকে জগন্নাথ ক্ষেত্র বাকী রাখে। তা হ'লে জগন্নাথ চিন্তা করতে করতে শরীর যাবে।"

অবশ্য ঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত পরমভক্ত ও কবি শ্রীঅক্ষয় কুমার সেন এই বলরাম-ভবনকেই 'জগন্নাথক্ষেত্র' রূপে উল্লেখ ক'রে লিখেছেন—

"ভবনের মহিমা কিবা না যায় বর্ণন।
গৌর-অবতারে যেন শ্রীবাস'-প্রাঙ্গন॥
জগন্নাথ-প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ঘরে।
ভোগ-রাগ নিতি নিতি অতি প্রীতিভরে॥
মঙ্গল-উৎসব ধ্বনি উঠে দিবারাত্র।
বসুর ভবন ঠিক জগন্নাথক্ষেত্র॥" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি)

আবার কথামৃতকার এই বাড়িতে ঠাকুরের লীলামাহাত্ম্য বর্ণনায় লিখেছেন :—"ধন্য বলরাম! তোমারই আলয় আজ ঠাকুরের প্রধান কর্মক্ষেত্র হইয়াছে। কত নূতন নূতন ভক্তকে আকর্ষণ করিয়া প্রেমডোরে বাঁধিলেন, ভক্তসঙ্গে কত নাচিলেন, গাইলেন। যেন শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাসমন্দিরে প্রেমের হাট বসাচ্ছেন!

"দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটীতে ব'সে ব'সে কাঁদেন; নিজের অন্তরঙ্গ দেখিবেন ব'লে ব্যাকুল! রাত্রে ঘুম নাই। মাকে বলেন, 'মা' ওর বড় ভক্তি, ওকে টেনে নাও; মা ওকে এখানে এনে দাও; যদি সে না আসতে পারে, তা হ'লে মা আমায় সেখানে লয়ে যাও, আমি দেখে আসি।' তাই বলরামের বাড়িতে ছুটে আসেন। লোকের কাছে কেবল বলেন, 'বলরামের ৺জগন্নাথের সেবা আছে, খুব শুদ্ধ অন্ন'। যখন আসেন অমনি নিমন্ত্রণ করিতে বলরামকে পাঠান। বলেন, 'যাও—নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখালকে নিমন্ত্রণ ক'রে এসো। এদের খাওয়ালে নারায়ণকে খাওয়ান হয়। এরা সামান্য নয়, এরা ঈশ্বরাংশে জন্মেছে। এদের খাওয়ালে তোমার খুব ভাল হবে।'

"বলরামের আলয়েই শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষের সঙ্গে প্রথম ব'সে আলাপ।

এইখানেই রথের সময় কীর্তনানন্দ। এইখানেই কতবার "প্রেমের দরবারে আনন্দের মেলা হইয়াছে।" (কথামৃত-১ম ভাগ, চতুর্দশ খণ্ড-১ম পরিচ্ছেদ)

[প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ঠাকুরের সব রকম লীলা স্মৃতি ও অবশেষে মাধুরী মণ্ডিত অন্তলীলার স্মৃতিবাহী এই প্রখ্যাত বাড়ির পূর্বের ঠিকানা ছিল—৫৭ নং রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট; পরে বাড়ির সংলগ্ন নতুন রাস্তা তৈরী হলে ঠিকানার পরিবর্তন হয়; বর্তমান নতুন ঠিকানা—৭ নং গিরিশ এ্যাভিনিউ, কলিকাতা—৩; উত্তর কলকাতা শ্যামবাজারের পাঁচ-মাথার মোড় থেকে ভূপেন্দ্র বসু এ্যাভিনিউ ধ'রে পশ্চিমের দিকে রাজবল্লভ পাড়ায় এগিয়ে গেলে, উত্তরে ডানদিকে পড়ে গিরিশ এ্যাভিনিউ;—এই রাস্তায় ঢুকে সামান্য একটু এগুলেই রাস্তার বামদিকে (গিরিশ এ্যাভিনিউ ও রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটের সংযোগ স্থলে) 'বলরাম মন্দির' নামাঙ্কিত সেই পবিত্র বাড়ি।]

[আলোচ্য বাড়িটি সাবেক ধরণের দোতলা। উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত এই বাড়ির প্রধান প্রবেশ পথ দক্ষিণ দিকে,—পাশের একটি দরজা দিয়ে বাড়ির পিছনের অংশে যাওয়া যায়। বহির্বাটীতে প্রবেশ ক'রে বামদিকে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলে, ডানদিকে একটি বড় হল ঘর ও তার সংলগ্ন আর একখানি ঘর। হলঘরটিতে ঠাকুর ভক্তসঙ্গে মিলিত হতেন এবং নৃত্য গীতাদি ও ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করতেন, আর সংলগ্ন ঘরটিতে রাত্রিবাস করতেন। বর্তমানে ঠাকুরের শয়ন ঘরটিকে গর্ভ মন্দিররূপে ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে, আর হলঘরটিকে নাটমন্দির করা হয়েছে। দোতলার চকমিলানো ভিতরের প্রশস্ত বারান্দায় রথটানার ব্যবস্থা আছে এবং ঠাকুর কর্তৃক রথটানার স্মৃতি উপলক্ষে এখানে রথের দিন বিশেষ উৎসবও হয়। বর্তমানে বহির্বাটীতে (এক-তলাসহ) রামকৃষ্ণ মিশনের সাধু, ব্রহ্মচারী ভক্তগণ বাস করেন। বলরাম বসুর সুযোগ্য একমাত্র পুত্র, ভক্ত রামকৃষ্ণ বসুর শেষ ইচ্ছানুসারে, এই বাড়িতে ঠাকুরের ভাবধারা ও পুণ্যস্মৃতি সংরক্ষণের জন্য ১৯২২ সালের ৩১শে মার্চ জন-সাধারণের কল্যাণ ব্রতী 'ট্রাষ্ট' দলিলে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন কর্তৃক এই বাড়িটি ব্যবহারের নির্দেশ থাকে। সমগ্র বাড়িটি এইভাবে রামকৃষ্ণ মিশনকে উৎসর্গীকৃত হওয়ায় বর্তমানে এখানকার বহির্বাটীটি রামকৃষ্ণ মিশনের একটি মঠে পরিণত হয়েছে এবং মিশনের একটি কর্মকেন্দ্রও এখানে স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু এটির পরিচালনার ভার ট্রাষ্টিদের ওপরই নিয়োজিত।]

১৮৮৫ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর থেকে ২রা অক্টোবর—মাত্র সাতদিন ঠাকুর এখানে তাঁর শেষ লীলা করার পর, শ্যামপুকুর বাটীতে চ'লে গিয়েছিলেন।

এবার আমরা ঠাকুরের শ্যামপুকুর পর্বের লীলাস্বাদন ক'রে ধন্য হব।

শ্যামপুকুর পর্ব

এবার শুরু শ্যামপুকুর পর্ব। লীলাময়ের লীলার অন্ত নেই; এক এক পর্বে তাই বিচিত্র ধরণের লীলা ভক্তদের নিয়ে।

বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়ি ত্যাগ ক'রে এবার শ্যামপুকুরের বাড়িতে নবরূপে নব লীলা! বলরামের রামটুকু নিয়ে যুক্ত হলেন শ্যামপুকুরের শ্যামের সঙ্গে। হ্যাঁ—শ্যামপুকুরের শ্যামই বটে,—কারণ বাড়িটি গোকুলের, অর্থাৎ গোকুল ভট্টাচার্যের। এ যেন সব আগে থেকেই দৈব পরিকল্পনা—লীলা শেষ হবে কাশীতে, অর্থাৎ কাশীপুরে, তাই তার আগে এই সব তোড়জোড়। এসব লীলা সত্যই বোঝা দায়!

যাইহোক, ১৮৮৫ সালের ২রা অক্টোবর, ১২৯১ বঙ্গাব্দের ১৮ই আশ্বিন, শুক্রবার সন্ধ্যায় ভক্তদের একান্ত ইচ্ছায় ঠাকুর শ্যামপুকুরের এক ভাড়াটিয়া বাড়িতে শুভাগমন করেন এবং এই বাড়িতে ৭০ দিন অবস্থান করেন। বাড়ির মালিক ছিলেন গোকুল ভট্টাচার্য।

এই বাড়ির তৎকালীন বর্ণনায় স্বামী সারদানন্দ তাঁর 'লীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থের ৫ম ভাগে উল্লেখ করেছেন—"ঠাকুরের জন্য যে বাটীখানি এখন ভাড়া লওয়া হইল, উহা পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটের উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত। উত্তর মুখে বাটীতে প্রবেশ করিয়াই বামে ও দক্ষিণে বসিবার চাতাল ও স্বল্প পরিসর রক দেখা যাইত। উহা ছাড়াইয়া কয়েকপদ অগ্রসর হইলেই ডাইনে দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়ি ও সম্মুখে উঠান! উঠানের পূর্বদিকে দুই-তিনখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়াই দক্ষিণভাগে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত একখানি লম্বা ঘর, উহাই সর্বসাধারণের জন্য নির্দিষ্ট ছিল এবং বামে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত ঘরগুলিতে যাইবার পথ। উক্ত পথ দিয়া প্রথমেই 'বৈঠকখানা' ঘর নামে অভিহিত সুপ্রশস্ত ঘরখানিতে ঢুকিবার দ্বার—এই ঘরে ঠাকুর থাকিতেন। উহার উত্তরে ও দক্ষিণে বারান্দা, তন্মধ্যে উত্তরের বারান্দা প্রশস্তর ছিল এবং পশ্চিমে ছোট ছোট দুইখানি ঘর—একখানিতে ভক্তদিগের কেহ কেহ রাত্রিতে শয়ন করিত এবং অপরখানি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর রাত্রিবাসের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। তদ্ভিন্ন সাধারণের নিমিত্ত নির্দিষ্ট ঘরখানির পশ্চিমে স্বল্প পরিসর বারান্দা, ঠাকুরের ঘরে যাইবার পথের



শ্যামপুকুর বাটী

পূর্বপার্শ্বে ছাদে উঠিবার সিঁড়ি এবং ছাদে যাইবার দরজার পার্শ্বে চারিহাত আন্দাজ লম্বা ও ঐরূপ প্রশস্ত একটি আচ্ছাদনযুক্ত চাতাল ছিল। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ঐ চাতালটিতেই সমস্ত দিবস অতিবাহিত করিতেন এবং ঐ স্থানেই ঠাকুরের জন্য প্রয়োজনীয় পথ্যাদি রন্ধন করিতেন

ঠাকুরের অন্যতম কৃপাপ্রাপ্ত গৃহীভক্ত শ্রীঅক্ষয় কুমার সেন রচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি'তে উল্লেখ আছে :—

"শ্যামপুকুরের মধ্যে বাড়ি হইল স্থির।
যাহার পশ্চিমে এক শিবের মন্দির॥
দ্বিতল মহল বাড়ি, মাস ভাড়া ধার্য।
গৃহ স্বামী নামজাদা শিবু ভট্টাচার্য।"

এখানে উল্লেখ্য, 'লীলাপ্রসঙ্গ'-গ্রন্থে কথিত গোকুল ভট্টাচার্যের পিতার নাম শিবু ভট্টাচার্য এবং পিতৃনামেরই পরিচয়ে 'পুঁথি'তে শিবু ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

স্থান পরিবর্তন হলেও, রোগের কোন পরিবর্তন হ'ল না—তাই ডাক্তারের পরিবর্তন করা হল। এখানে প্রধানতঃ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের চিকিৎসাধীনেই ঠাকুর ছিলেন। এই প্রখ্যাত চিকিৎসকের সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা বিশেষ প্রয়োজন, কারণ, শ্যামপুকুর পর্বে তাঁর প্রসঙ্গ ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ১৮৩৩ সালে হাওড়া জেলার পাইকপাড়া-গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরবর্তীকালে কলকাতার শাঁখারীটোলায় স্থায়ীভাবে বাস করেন।

কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম. ডি. পরীক্ষা পাশ করার পর, তিনি বহুবাজার নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথী চিকিৎসক ডাঃ রাজেন্দ্রলাল দত্তের অধীনে হোমিওপ্যাথী শিক্ষা করেন। পরে এ্যালোপ্যাথীর বদলে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা শুরু ক'রে তিনি যশস্বী হন এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে পাণ্ডিত্য লাভ করেন। তিনি 'ক্যালকাটা জার্নাল অব মেডিসিন' নামক পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের জন্য উচ্চমানের একটি শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কলকাতার 'সেরিফ' ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যও হয়েছিলেন। ১৯০৪ সালে তাঁর দেহত্যাগ হয়।

বিজ্ঞান-জগতের ডাক্তার সরকারের সঙ্গে, মহাভাব-জগতের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মিলন—রামকৃষ্ণলীলার এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে, বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন মহেন্দ্রলাল পরবর্তী জীবনে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরীয়ভাবে মগ্ন হয়েছিলেন।

ঠাকুরের গলায় 'ক্যান্সার'-রোগ চিকিৎসা উপলক্ষেই উভয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হয়েছিল।

প্রখ্যাত কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন এবং কয়েকজন এ্যালোপ্যাথী চিকিৎসকগণের চিকিৎসায় ঠাকুরের রোগের কোন উপশম না হওয়ায়, ভক্তগণের অনুরোধে ডাক্তার সরকার হোমিওপ্যাথী মতে ঠাকুরের চিকিৎসা শুরু করেন। এই চিকিৎসা উপলক্ষেই ডাক্তার সরকার শ্যামপুকুর বাটীতে দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠাকুরের কাছে অবস্থান করতেন এবং ঈশ্বরীয় আলোচনায় যোগ দিয়ে তাঁর পূতসঙ্গ উপভোগ করতেন। ঠাকুরের উদার আধ্যাত্মিকতায় ও অমূল্য উপদেশে তিনি এত মুগ্ধ হতেন যে, ঠাকুরকে ও তাঁর ভক্তদের তিনি নিজের আত্মীয়ের মত জ্ঞান করতেন। বলা আবশ্যক, ঠাকুরের পরমভক্ত মথুরামোহন বিশ্বাসের উদ্যোগে বহুপূর্বে কোন এক সময়ে ডাক্তার সরকার সম্ভবতঃ ঠাকুরের তৎকালীন কোন অসুখের চিকিৎসা করেছিলেন এবং ডাক্তার সরকারের শাঁখারীটোলার বাড়িতেও চিকিৎসা উপলক্ষে একসময়ে ঠাকুরের শুভাগমনও হয়েছিল। শ্যামপুকুর বাটীতে ঠাকুরের চিকিৎসার খরচ তাঁর ভক্তেরা বহন করেন—এই কথা শোনার পর থেকেই তিনি বিনা পারিশ্রমিকে ঠাকুরের চিকিৎসা করতেন।

প্রধানতঃ শ্যামপুকুরে (এবং কাশীপুরে) চিকিৎসার সময় বহুদিন ডাক্তার সরকার, সমাধিস্থ অবস্থায় ঠাকুরের স্পন্দনহীন দেহ এবং লক্ষণাদি পরীক্ষা ক'রে বিস্মিত হন; ঠাকুরের মানসিক ও দৈহিক অপূর্ব অবস্থা—ডাক্তার সরকারের বিদ্যা, বুদ্ধি বা চিকিৎসাশাস্ত্রের অগম্য থাকায়, তাঁর সম্পর্কে ডাক্তার সরকারের একটি স্বাভাবিক কৌতূহলই ক্রমশঃ তাঁকে ঠাকুরের প্রতি বিশেষ অনুরাগী ক'রে তুলেছিল। বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে বহুবার ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে তর্কে পরাভূত হয়ে, ডাক্তার সরকার বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও অবশেষে ঠাকুরের চরণধূলি গ্রহণ করেছিলেন। ঠাকুরের মুখে গান শুনে তিনি ভাবাবিষ্ট হতেন এবং সঙ্গলাভের জন্য সর্বদা উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতেন। বাইরের বহু কর্তব্যকর্ম ভুলে শ্যামপুকুরে তিনি ঠাকুরের কাছে তন্ময় হ'য়ে বসে থাকতেন এবং কিছুদিন ঠাকুরকে দেখতে না পেলে তাঁর প্রাণের ভিতর ছট্‌ফট্ করত। ঠাকুরও ডাক্তার সরকারকে খুব শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁকে কাছে পেলে খুব আনন্দ পেতেন। ঠাকুর তাঁকে 'গম্ভীরাত্মা' ব'লে নির্দেশ করেছিলেন এবং ভাবস্থ অবস্থায় ডাক্তার সরকারের কোলে নিজের চরণ স্থাপন ক'রে ঠাকুর তাঁকে কৃপা করেছিলেন। পরে তাঁকে ঠাকুর বলেছিলেন —'তুমি খুব শুদ্ধ! তা না হলে পা রাখতে পারি না'।

প্রসঙ্গতঃ বলা আবশ্যক, ডাক্তার সরকারের পুত্র অমৃত সরকারও ঠাকুরের

কৃপা লাভ করেছিলেন এবং স্বামী বিবেকানন্দ, গিরিশচন্দ্র, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্তদের সঙ্গেও ডাক্তার সরকারের মধুর সম্পর্ক ছিল। দুঃখের বিষয়,—সাধ্যমত চেষ্টা করেও তিনি ঠাকুরের রোগ নিরাময় করতে অক্ষম হয়েছিলেন।

শ্যামপুকুর পর্বে ঠাকুরের অন্তলীলার প্রধান সঙ্গীদের মধ্যে ডাক্তার সরকারই সম্ভবত প্রধানতম ছিলেন, একথা বলতে দ্বিধা নেই। শ্যামপুকুর পর্বে, ডাক্তার সরকারকে বাদ দিয়ে ঠাকুরের অন্তলীলা চিন্তা করা যায় না; তাই এই লীলায় শ্যামপুকুরে ডাক্তার সরকারকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যে কথামৃত দান করেছিলেন, যা এই লীলার বৈশিষ্ট্য, তার কিছু অমৃত পরশ :—

"যার ঈশ্বরে মন সেইতো মানুষ—মানুষ আর মান হুঁশ। যার হুঁশ আছে, চৈতন্য আছে, যে নিশ্চিত জানে, ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য—সেই মান হুঁশ। ...আর এসব জীব জগৎ, তাঁর ঐশ্বর্য। এ মানলেই হ'লো। যেমন বড় মানুষ আর তার বাগান। এ রকম আছে, দশ অবতার—চব্বিশ অবতার,—আবার অসংখ্য অবতার। যেখানে তাঁর বিশেষ শক্তি প্রকাশ, সেখানেই অবতার! তাই ত আমার মত। আর এক আছে, যা কিছু দেখছো এসব তিনি হয়েছেন। যেমন বেল,—বিচি, খোলা, শাঁস তিন জড়িয়ে এক। যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা; যাঁরই লীলা, তাঁরই নিত্য। নিত্যকে ছেড়ে শুধু লীলা বুঝা যায় না। লীলা আছে ব'লেই ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে নিত্যে পৌঁছান যায়। অহং বুদ্ধি যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ লীলা ছাড়িয়ে যাবার যো নাই। নেতি নেতি ক'রে ধ্যানযোগের ভিতর দিয়ে নিত্যে পৌঁছান যেতে পারে। কিন্তু কিছু ছাড়বার যো নাই। যেমন বললাম—বেল।" (কথামৃত-৩য় ভাগ, বিংশখণ্ড—৩য় পরিচ্ছেদ)

* * *

"অনন্ত সমুদ্র, জলেরও অবধি নাই। তবে ভিতরে যেন একটি ঘট রয়েছে। বাহিরে ভিতরে জল। জ্ঞানী দেখে—অন্তরে বাহিরে সেই পরমাত্মা। তবে ঘটটি কি? ঘট আছে ব'লে জল দুইভাগে দেখাচ্ছে, অন্তর বাহির বোধ হচ্ছে। 'আমি' ঘট থাকলে এই বোধ হয়। ঐ 'আমিটি' যদি যায়, তাহলে যা আছে তাই, মুখে বলবার কিছু নাই। জ্ঞানীর ধ্যান আর কি রকম জান? অনন্ত আকাশ, তাতে পাখী আনন্দে উড়ছে, পাখা বিস্তার ক'রে। চিদাকাশ, আত্মা-পাখী খাঁচায় নাই, চিদাকাশে উড়ছে! আনন্দ ধরে না!" (কথামৃত-৩য় ভাগ, একবিংশ খণ্ড—৩য় পরিচ্ছেদ)

* * *

"যে ব্যক্তি সদা সর্বদা ঈশ্বর চিন্তা করে, সেই জানতে পারে, তাঁর স্বরূপ কী।

সে ব্যক্তিই জানে, ঈশ্বর নানারূপে দেখা দেন। নানাভাবে দেখা দেন। তিনি সগুণ, আবার নির্গুণ। গাছতলায় যে থাকে, সেই জানে যে বহুরূপীর নানারঙ, আবার কখন কখন কোন রঙই থাকে না। অন্যলোকে কেবল তর্ক ঝগড়া ক'রে কষ্ট পায়। তিনি সাকার, আবার নিরাকার। কি রকম জান? যেন সচ্চিদানন্দ সমুদ্র। কুল-কিনারা নাই। ভক্তিহিমে সেই সমুদ্রের স্থানে স্থানে জল বরফ হয়ে যায়, যেন জল বরফ আকারে জমাট বাঁধে; অর্থাৎ, ভক্তের কাছে তিনি সাক্ষাৎ হ'য়ে কখন কখন সাকার রূপ হয়ে দেখা দেন। আবার জ্ঞানসূর্য উঠলে সে বরফ গ'লে যায়।·········অর্থাৎ 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' এই বিচারের পর সমাধি হলে রূপ-টুপ উড়ে যায়। তখন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি ব'লে বোধ হয় না। কী তিনি, মুখে বলা যায় না। কে বলবে? যিনি বলবেন, তিনিই নাই। তাঁর 'আমি' আর খুঁজে পান না। তখন ব্রহ্ম নির্গুণ। তখন তিনি কেবল বোধে বোধ হন। মন বুদ্ধিদ্বারা তাঁকে ধরা যায় না। তাই বলে, ভক্তি—চন্দ্র, জ্ঞান-সূর্য। শুনেছি, খুব উত্তরে আর দক্ষিণে সমুদ্র আছে। এত ঠাণ্ডা যে, জল জমে মাঝে মাঝে বরফের চাঁই হয়। জাহাজ চলে না। সেখানে গিয়ে আটকে যায়।"

(কথামৃত ১ম ভাগ, পঞ্চদশ খণ্ড—২য় পরিচ্ছেদ)

*　　　*　　　*

"চার-পাঁচজনের জ্ঞান হয় না। যার বিদ্যার অহঙ্কার, যার পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, যার ধনের অহঙ্কার, তার জ্ঞান হয় না! এসব লোককে যদি বলা যায় যে, অমুক জায়গায় বেশ একটি সাধু আছে, দেখতে যাবে? তারা অমনি নানা ওজর ক'রে বলে, যাব না। আর মনে মনে বলে, 'আমি এত বড় লোক, আমি যাব?' তমোগুণের স্বভাব অহঙ্কার। অহঙ্কার অজ্ঞান থেকে হয়, তমোগুণ থেকে হয়! ······তাঁর যদি একবার কৃপা হয়, ঈশ্বরের যদি একবার দর্শন লাভ হয়, আত্মার যদি একবার সাক্ষাৎকার হয়, তা'হলে আর কোন ভয় নাই—তখন ছয় রিপু আর কিছু করতে পারবে না। নারদ, প্রহ্লাদ এই সব নিত্য সিদ্ধ মহাপুরুষদের অত ক'রে চক্ষের দুদিকে ঠুলি দিতে হয় না। যে ছেলে নিজে বাপের হাত ধ'রে মাঠের আলপথে চলছে, সে ছেলে বরং অসাবধান হয়ে বাপের হাত ছেড়ে দিয়ে খানায় পড়তে পারে। কিন্তু বাপ যে ছেলের হাত ধরে, সে কখনও খানায় পড়ে না।"　(কথামৃত-১ম ভাগ, পঞ্চদশ খণ্ড—২য় পরিচ্ছেদ)

*　　　*　　　*

'কথামৃত' গ্রন্থে শ্যামপুকুর বাটী প্রসঙ্গে ডাক্তার সরকার ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের

মিলনকালে এরূপ অমৃতকথার স্রোতস্বিনী নানাস্থানে প্রবাহিত। জ্ঞানী ডাক্তারের সঙ্গে ঠাকুরের যে কথোপকথন, সবই ডাক্তারের আধার অনুযায়ী নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ। করুণাময় ঠাকুরের কৃপায় এইভাবে ডাক্তার জ্ঞান থেকে ভক্তির রাজ্যে প্রবেশ করেন এবং জ্ঞানমিশ্রিত ভক্তির রাজা রূপে পরবর্তীকালে অধিষ্ঠিত হন। ঠাকুরের শারীরিক চিকিৎসা করতে এলে, ঠাকুরই ডাক্তার সরকারের আত্মিক চিকিৎসার দ্বারা তাঁকে আধ্যাত্মিক জগতে উন্নীত করেন—শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলায় শ্যামপুকুর পর্বে এটি একটি বিশেষ ঘটনা! সর্বধর্ম-সমন্বয়কারী শ্রীরামকৃষ্ণ জীবকুলের সকল মনকেও যে একটি 'সমন্বয়' সূত্রে বেঁধেছিলেন, এটি তাঁর অলৌকিক ভাবরসে সমৃদ্ধ অবতারত্বের পরিচয়। আমাদের নিজেদের মনে মনে মিল না থাকায়, ধর্মে ধর্মে তাই মিল নেই; কুসংস্কার, অজ্ঞানতা, দাম্ভিকতা, ধর্মোন্মত্ততা প্রভৃতিতে আমাদের মন কণ্টকিত; কণ্টকে ভগবানের পূজা হয় না —পুষ্প দ্বারা পূজা হয়। মনটিকে পুষ্পের ন্যায় প্রস্তুত করতে গেলে, জ্ঞান এবং ভক্তি—দুটিরই প্রয়োজন। ডাক্তার সরকারকে উপলক্ষ্য ক'রে ঠাকুর সমগ্র মনুষ্যকুলকে নানা শিক্ষাদান ক'রেছেন এবং পরিপূর্ণভাবে 'ঈশ্বরনির্ভর' হতে উপদেশ দিয়েছেন। 'গম্ভীরাত্মা' ডাক্তার সরকার প্রকৃতপক্ষে 'ভক্তাত্মা'তেই রূপান্তরিত হয়েছিলেন।

এখানে আর একটি জিনিসও লক্ষ্য করা যায়। যাঁর কণ্ঠে অত কষ্ট, প্রায়শঃই রুধিরনির্গত, ক্ষীণ দেহ,—তিনি দেহের সমস্ত যন্ত্রণা উপেক্ষা ক'রে বিশ্বমানবের কল্যাণে উপদেশামৃত বিতরণ ক'রে চলেছেন অকাতরে। তাই ঠাকুরের এই কণ্ঠ রোগের অলৌকিক গূঢ় রহস্যের কারণ ভক্তগণ নানাভাবে বিশ্লেষণ ক'রেছিলেন এবং এটি তাঁর 'স্বেচ্ছায় রোগ' ব'লেও অনেকে ধারণা করেছিলেন। কিন্তু শ্যামপুকুর পর্বেই ঠাকুরের এই গলরোগের কারণ, আমরা তাঁর মুখ থেকেই শুনতে পাই, যেটি তিনি নিজ মুখে প্রকাশ ক'রে না গেলে আমরা তাঁর অবতারলীলার এই দুর্বোধ্য বিষয়টি সম্পর্কে চিরদিনই ভ্রান্ত ধারণায় পরিচালিত হতাম। তাই সেই প্রসঙ্গটি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই।

এখানে একদিন ঠাকুরের এমন এক অদ্ভুত দর্শন হয়, যাতে তিনি লক্ষ্য করেন যে, তাঁর স্থূল দেহের ভিতর থেকে সূক্ষ্মশরীর নির্গত হ'য়ে গৃহমধ্যে বিচরণ করছে এবং তাঁর গলায় কতকগুলি ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর ঐ ক্ষত সৃষ্টির কারণ কি হতে পারে—বিস্মিতভাবে এই চিন্তা করার সময় শ্রীশ্রীজগন্মাতা তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে অপবিত্র লোকেরা তাঁর চরণ স্পর্শ ক'রে পাপমুক্ত হয়ে যাচ্ছে আর তাদেরই অসহ্য পাপভারে স্পর্শদোষে তাঁর শরীরে এই ক্ষত হয়েছে। ঠাকুর

তাঁর এই অদ্ভুত দর্শনের কথা সেদিন তাঁর ভক্তদের কাছে প্রকাশ ক'রেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, ঠাকুরের গলরোগের বিশেষ কারণ সম্পর্কে একদা ঠাকুর শ্রীশ্রীমাসারদা দেবীকেও জানিয়েছিলেন যে, ভক্ত গিরিশের পাপ নিয়েই তাঁর এই ব্যাধি। কারণ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ সারাজীবন অনেক রকম গর্হিত কাজ করার পরেও, ঠাকুর গিরিশচন্দ্রের 'বকল্‌মা' (সকল প্রকার ভার) গ্রহণ করায়, গিরিশচন্দ্রের পাপের ভাগও ঠাকুরকে নিতে হয়েছিল, যে জন্য পরবর্তীকালে ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র ঠাকুরকে বলেছিলেন—'তুমি আসবে, আগে জানলে আরো বেশী পাপ করতাম।'

'লীলাপ্রসঙ্গ'-গ্রন্থের ৫ম খণ্ডে স্বামী সারদানন্দ ঠাকুরের এই অলৌকিক দর্শন সম্পর্কে লিখেছেন :—

"শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে এক দিবস এক অদ্ভুত দর্শন উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি দেখিয়াছিলেন, তাঁর সূক্ষ্মশরীর স্থূলদেহের অভ্যন্তর হইতে নির্গত হইয়া গৃহ-মধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে এবং তাঁহার গলার সংযোগস্থলে পৃষ্ঠদেশে কতকগুলি ক্ষত হইয়াছে। বিস্মিত হইয়া তিনি ঐরূপ ক্ষত হইবার কারণ কি ভাবিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীশ্রীজগদম্বা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন, নানারূপ দুষ্কর্ম করিয়া আসিয়া লোকে তাঁহাকে স্পর্শপূর্বক পবিত্র হইয়াছে, তাহাদের পাপভার ঐরূপে তাঁহাতে সংক্রামিত হওয়ায় তাঁহার শরীরে ক্ষতরোগ হইয়াছে। জীবের কল্যাণসাধনে তিনি লক্ষ লক্ষ বার জন্ম পরিগ্রহপূর্বক দুঃখভোগ করিতে কাতর নহেন, একথা আমরা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে সময়ে সময়ে বলিতে শুনিয়াছিলাম, সুতরাং পূর্বোক্ত দর্শনে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া আনন্দের সহিত তিনি যে এখন ঐ বিষয়ে আমাদিগকে বলিবেন, ইহা বিচিত্রবোধ হইল না এবং উহাতে তাঁহার অপার করুণার কথা স্মরণ ও আলোচনা করিয়া আমরা মুগ্ধ হইলাম। কিন্তু ঠাকুরের শরীর পূর্বের ন্যায় সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত যাহাতে কোন নূতন লোক আসিয়া তাঁহার চরণস্পর্শপূর্বক প্রণাম না করে, তদ্বিষয়ে ভক্তদিগের—বিশেষতঃ যুবক-ভক্তদিগের মধ্যে উহাতে বিশেষ প্রয়াস উপস্থিত হইল এবং ভক্তিপূর্বক এখন হইতে ঠাকুরের পবিত্রদেহ আর স্পর্শ করিবেন না, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া বসিলেন। আবার নরেন্দ্র প্রমুখ বিরল কোন কোন ব্যক্তি উক্ত দর্শনের কথা শুনিয়া অন্যকৃতকর্মের জন্য অন্যের স্বেচ্ছায় ফলভোগ করা রূপ যে মতবাদ খ্রীষ্টান, বৈষ্ণব প্রভৃতি কোন কোন ধর্মের মূলভিত্তিস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে, উহাতে তাহারই সত্যতার ইঙ্গিত প্রাপ্ত হইয়া ঐ বিষয়ের চিন্তা ও গবেষণায় নিযুক্ত হইলেন।"

উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভক্তগণ কর্তৃক ঠাকুরের কাছে নূতন লোকের

গমনাগমন বন্ধ করা হয় এবং দ্বাররক্ষক হিসাবে ত্যাগী ভক্ত নিরঞ্জনকে (স্বামী নিরঞ্জনানন্দ) নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু এত সাবধানতা সত্বেও লীলাময়ের লীলায় শ্যামপুকুরে এক নূতন সংযোজন ঘটে। এই ঘটনার প্রধান নায়িকা ছিলেন ভক্তিমতী নটী শ্রীমতী বিনোদিনী, যাঁর সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা প্রয়োজন।

তৎকালীন প্রখ্যাত অভিনেত্রী শ্রীমতী বিনোদিনীর জন্ম ১৮৬৩ সালে। নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র পরিচালিত নাট্যশালায় নটীরূপে বিনোদিনী নিয়মিত অভিনয় করতেন এবং দর্শকদের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করতেন। অভিনয় উপলক্ষেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। তিনি কয়েকখানি গ্রন্থও রচনা করেছিলেন।

একদা কলকাতার ষ্টার থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের বিখ্যাত 'চৈতন্যলীলা' নাটকের প্রধান ভূমিকায় বিনোদিনীর অভিনয়কালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অপূর্ব অভিনয় দেখে মুগ্ধ হন এবং বিশেষ প্রশংসা করেন। সেই নাটকে পতিতা স্ত্রীলোকেরা অভিনয় ক'রেছে শুনে ঠাকুর বলেন—'আমি তাদের মা-আনন্দময়ী দেখব। তারা চৈতন্যদেব সেজেছে, তা হ'লেই-বা। শোলার আতা দেখলে সত্যকার আতার উদ্দীপন হয়।' সেদিন অভিনয় শেষে বিনোদিনী ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের চরণ বন্দনা করেন এবং আশীর্বাদ লাভ ক'রে ধন্য হন। এই দর্শনের পর থেকেই বিনোদিনী, ঠাকুরকে সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞানে অন্তরে গ্রহণ করেন এবং মনে মনে ঠাকুরের প্রতি ভক্তিতে পূর্ণ থাকেন। বিনোদিনী অভিনীত আরো কয়েকটি নাটক ঠাকুর দর্শন ক'রেছিলেন।

শ্যামপুকুর পর্বে দেখা যায়, অসুস্থ ঠাকুরকে দর্শন করার জন্য একদা বিনোদিনী বিশেষ উতলা হন; কিন্তু সে সময় ঠাকুরের কাছে কোন মহিলাকে পাঠানো সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ থাকায়, বিনোদিনী ঠাকুরের দ্বার-রক্ষক স্বামী নিরঞ্জনানন্দের কড়া পাহাড়া অতিক্রম করতে বিশেষ অসুবিধায় পড়েন। পরে ঠাকুরের অপর গৃহীভক্ত কালীপদ ঘোষ, তথা দানা-কালীর সহায়তায় পুরুষের বেশ ধারণ ক'রে তিনি ছদ্মবেশে প্রাণের টানে অসুস্থ ঠাকুরকে দেখার উদ্দেশ্যে সকল বাধা অতিক্রম করেন এবং শ্যামপুকুরের বাড়িতে ঢুকে দোতলায় ঠাকুরের ঘরে উপস্থিত হয়ে অশ্রুবিসর্জন করতে থাকেন। ঠাকুর তাঁর ব্যাকুলতা দর্শন ক'রে তাঁকে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়ার জন্য উপদেশ দেন। ঠাকুরের কৃপালাভ ক'রে সেদিন বিনোদিনী ঠাকুরের চরণে মস্তক স্পর্শ করে সজল নয়নে বিদায় নিয়েছিলেন।

এই সম্পর্কে 'লীলাপ্রসঙ্গ'-গ্রন্থের ৫ম খণ্ডে উল্লেখ করা হয়েছে—"ঠাকুরের

নিদারুণ পীড়ার কথা শুনিয়া সে এখন তাঁহাকে একবার দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং শ্রীযুক্ত কালীপদ ঘোষের সহিত পরিচিত থাকায় বিশেষ অনুনয় বিনয়পূর্বক ঐ বিষয়ের জন্য তাঁহার শরণাপন্ন হইল। কালীপদ সকল বিষয়ে গিরিশচন্দ্রের অনুগামী ছিলেন এবং ঠাকুরকে যুগাবতার বলিয়া ধারণা করায়,—দুষ্কৃতকারী অনুতপ্ত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণ স্পর্শ করিলে তাঁহার রোগ বৃদ্ধি হইবে—একথায় আস্থাবান ছিলেন না। সুতরাং ঠাকুরের নিকটে উক্ত অভিনেত্রীকে আনয়ন করিতে তাঁহার মনে কোনরূপ দ্বিধা বা ভয় আসিল না। গোপনে পরামর্শ করিয়া একদিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি তাহাকে পুরুষের ন্যায় 'হ্যাট কোটে" সজ্জিত করিয়া শ্যামপুকুরের বাসায় উপস্থিত হইলেন এবং নিজ বন্ধু বলিয়া আমাদিগের নিকট পরিচয় প্রদানপূর্বক ঠাকুরের সমীপে লইয়া যাইয়া তাহার যথার্থ পরিচয় প্রদান করিলেন। ঠাকুরের ঘরে তখন আমরা কেহই ছিলাম না, সুতরাং ঐরূপ করিবার পথে তাঁহাকে কোন বাধাই পাইতে হইল না। আমাদিগের চক্ষে ধূলি দিবার জন্যই অভিনেত্রী এরূপ বেশে আসিয়াছে জানিয়া রঙ্গপ্রিয় ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন এবং তাহার সাহস ও দক্ষতার প্রশংসাপূর্বক তাহার ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর ঈশ্বরে বিশ্বাসবর্তী ও তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া থাকিবার জন্য তাহাকে দুই চারিটি তত্ত্বকথা বলিয়া অল্পক্ষণ পরে বিদায় দিলেন। সেও অশ্রুবিসর্জন করিতে করিতে তাঁহার শ্রীচরণে মস্তক স্পর্শপূর্বক কালীপদের সহিত চলিয়া যাইল। ঠাকুরের নিকট হইতে পরে একথা আমরা জানিতে পারিলাম এবং আমরা প্রতারিত হওয়ায় তিনি হাস্য-পরিহাস ও আনন্দ করিতেছেন দেখিয়া কালীপদের উপরে বিশেষ ক্রোধ করিতে পারিলাম না।"

ভগবানের প্রতি আন্তরিক টানে তাঁর দর্শনের জন্য ভক্ত যে কোন উপায় অবলম্বন করে এবং তাতে সফলও হয়—শ্যামপুকুরের এই ঘটনাই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

পরবর্তীকালে, বিনোদিনীর জীবনে পরিবর্তন আসে এবং অবশেষে তিনি তপস্যাময় জীবনযাপন শুরু করেন। ঠাকুরের দেহরক্ষার পরেও তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ ঠাকুরের অন্তরঙ্গ-পার্ষদগণের সঙ্গে বেলুড় মঠে যথাসম্ভব যোগাযোগ রক্ষা করেছিলেন। শেষ জীবনে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠে স্বামী অভেদানন্দের সান্নিধ্যে আসেন এবং ১৯৪২ সালে দেহত্যাগ করেন।

* * *

শ্যামপুকুরে অন্ত্যলীলা পর্বে আর একটি ঘটনায় ঠাকুরের ঐশ্বরিক শক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ঘটনাটির সঙ্গে ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র জড়িত থাকায় তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত গৃহী শিষ্য সুরেন্দ্রনাথ মিত্র উত্তর কলকাতার সিমুলিয়া স্ট্রীটে আনুমানিক ১৮৫০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বিলাতী 'ডফ্ট্ কোম্পানী'র উচ্চপদে নিযুক্ত থেকে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন এবং প্রথম জীবনে সাহেবী ভাবাপন্ন অবস্থায় প্রচণ্ড সুরাপানে অভ্যস্ত হন। কিন্তু সুখের প্রাবল্য থাকলেও, প্রাণে কোন প্রকার শান্তি না থাকায় একদা সুরেন্দ্রনাথ বিষপানে আত্মহত্যা করার জন্য যখন মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়েছিলেন, ঠিক সেই সময়ে তাঁর বন্ধুদ্বয়—শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত এবং মনোমোহন মিত্রের পরামর্শে তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যাওয়ার সুযোগ পান।

এরপর থেকেই সুরেন্দ্রনাথের জীবনে আমূল পরিবর্তন আসে এবং তিনি সর্বদাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্মরণ মনন করতে থাকেন। তিনিও যেমন বহুবার দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে গিয়েছিলেন, করুণাময় ঠাকুরও তেমন বহুবার তাঁর সিমুলিয়ার বাড়িতে শুভাগমন ক'রে নানাভাবে তাঁকে কৃপা করেছিলেন। ঠাকুর তাঁকে কখনো 'সুরেন্দর', কখনো বা 'সুরেশ' বলে সম্বোধন করতেন, এমন কি, এই ভাগ্যবান ভক্তকে একবার ঠাকুর তাঁর কণ্ঠের প্রসাদী মালা পরিয়ে দিয়েও বিশেষ কৃপা করেছিলেন। ঠাকুরের সঙ্গে এই মহামিলনের ফলে, সুরেন্দ্রনাথের অশান্ত জীবন সম্পূর্ণ সংহত হয় এবং তিনি ঠাকুরকে 'গুরুরূপে বরণ করেন।

সুরেন্দ্রনাথের কাঁকুড়গাছির বাগানে এবং সিমুলিয়ার বাড়িতে ঠাকুর ও তাঁর ভক্তবৃন্দের বহুবার আগমন ঘটায়, ঠাকুরের কৃপাতে তাঁর বাড়িটিও পূর্ণ ছিল। তাঁদের তৃপ্তির জন্য সুরেন্দ্রনাথ সব রকম ব্যবস্থা নিতেন এবং অকাতরে অর্থ ব্যয় করতেন। এমন কি, ঠাকুরের আগমন উপলক্ষে সঙ্গীতাদি পরিবেশনের ব্যবস্থাও তাঁর বাড়িতে হ'ত এবং এইরকম এক ঘটনায় সুরেন্দ্রনাথের বাড়িতে স্বামী বিবেকানন্দ (তৎকালীন নরেন্দ্রনাথ দত্ত) প্রথম ঠাকুরকে দর্শনের পর গান গেয়ে শোনান; ঠাকুরও এই প্রথম নরেন্দ্রনাথের গান শুনে সুরেন্দ্রনাথের বাড়িতে ভাবাবিষ্ট হন। সুরেন্দ্রনাথের বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পূজা, অন্নপূর্ণা পূজা, কালী পূজা, দুর্গাপূজা প্রভৃতি উৎসবাদিতে ঠাকুর যোগদান করতেন এবং বিচিত্র ঘটনার মাধ্যমে তাঁর বিশ্বাস উৎপাদনে সাহায্য করতেন। ঠাকুরের যে-কোন সেবাকার্যে সুরেন্দ্রনাথ এগিয়ে যেতেন বলে, ঠাকুর তাঁকে অন্যতম 'রসদ্দার' ব'লে উল্লেখ করেছিলেন। ঠাকুরের জীবদ্দশাতেই ১৮৮১ সালে দক্ষিণেশ্বরে নিজ ব্যয়ে ও উদ্যোগে সুরেন্দ্রনাথই প্রথম 'শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব' প্রবর্তন করেন এবং পরবর্তী-কালেও এই উৎসবের অধিকাংশ খরচ তিনি নিজেই বহন করেছিলেন। ঠাকুরের অসুস্থতার সময় কাশীপুরের উদ্যানবাটীর ৮০ টাকা ভাড়া ও অন্যান্য খরচ

বাবদ মাসিক ২০০ টাকা তৎকালে তিনি একাই বহন করতেন। ঠাকুরের দেহরক্ষার পর কাশীপুরের উদ্যানবাটী ছেড়ে ঠাকুরের কয়েকজন ত্যাগী সন্তান যখন অনাথের মতন বিভিন্ন তীর্থ ঘুরে বেড়াতেন, তখন একদিন ভাগ্যবান সুরেন্দ্রনাথ অকস্মাৎ ঠাকুরের দর্শন পান এবং তাঁর ত্যাগী সন্তানদের সুব্যবস্থার জন্য ঠাকুরের আদেশ পান। এই অলৌকিক ঘটনার ফলে সুরেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং বরানগরে গঙ্গাতীরে একটি বাড়ি ঠিক ক'রে দেন, যেখানে ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের আগমনে আদি মঠের সূচনা হয়। ১৮৯০ সালের ২৫শে মে সুরেন্দ্রনাথ কলকাতায় দেহত্যাগ করেন।

এই পরমভক্ত সুরেন্দ্রনাথের বাড়িতেই তাঁর গভীর আগ্রহে ভাবাবেশে জ্যোতিপথে ঠাকুর অসুস্থ অবস্থায় শ্যামপুকুর বাটী থেকে শারদীয়া মহাপূজায় উপস্থিত হয়েছিলেন। এ-ও এক বিচিত্র লীলা!

এই সম্পর্কে 'লীলাপ্রসঙ্গ'-গ্রন্থের ২য় খণ্ডে স্বামী সারদানন্দের একটি বিশদ বিবরণ থেকে জানা যায় :—'১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগ, আশ্বিন মাস, ৺শারদীয়া পূজা মহোৎসবে কলিকাতা নগরীর আবাল-বৃদ্ধবণিতা প্রতি বৎসর যেমন মাতিয়া থাকে, সেইরূপ মাতিয়াছে। সে আনন্দের প্রবাহ ঠাকুরের ভক্তদিগের প্রাণে বিশেষরূপে অনুভূত হলেও উহার বাহ্যপ্রকাশের পথে বিশেষ বাধা উপস্থিত হইয়াছে। কারণ, যাঁহাকে লইয়া তাহাদের আনন্দোল্লাস, তাঁহার শরীরই এখন অসুস্থ—ঠাকুর গলরোগে আক্রান্ত।...ঠাকুরের পরমভক্ত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র—যাঁহাকে তিনি কখন কখন 'সুরেশ মিত্র' বলিতেন—তাঁহার সিমলার ভবনে এ বৎসর পূজা আনিয়াছেন। পূর্বে তাঁহাদিগের বাটীতে প্রতি বৎসর পূজা হইত, কিন্তু একবার বিশেষ বিঘ্ন হওয়ায় অনেকদিন বন্ধ ছিল। বাটীর কেহই আর এ পর্যন্ত পূজা আনিতে সাহসী হয়েন নাই ; আবার কেহ ঐ বিষয়ে উদ্যোগী হইলে অপর সকলে তাঁহাকে ঐ সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত করিয়াছিলেন। ঠাকুরের বলে বলীয়ান সুরেন্দ্রনাথ দৈববিঘ্নের ভয় রাখিতেন না এবং একবার কোন বিষয় করিব বলিয়া সঙ্কল্প করিলে কাহারও কোন ওজর আপত্তি গ্রাহ্য করিতেন না। বাটীর সকলে নানা চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে এ বৎসর পূজার সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত করিতে পারেন নাই। তিনি ঠাকুরকে জানাইয়া সমস্ত ব্যয়ভার নিজেই বহন করিয়া শ্রীশ্রীজগদম্বাকে বাটীতে আনয়ন করিয়াছেন। শরীরের অসুস্থতা বশতঃ ঠাকুর আসিতে পারিবেন না বলিয়াই কেবল সুরেন্দ্রের আনন্দে নিরানন্দ। আবার পূজার অল্পদিন পূর্বে দুই-একজন পীড়িত হইয়া পড়ায় তিনিই ঐ জন্য দোষী সাব্যস্ত হইয়া বাটীর সকলের বিরক্তিভাজন হইয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও

বিচলিত না হইয়া সুরেন্দ্রনাথ ভক্তির সহিত শ্রীশ্রীজগন্মাতার পূজা আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং সকল গুরুভ্রাতাকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

"সপ্তমীপূজা হইয়া গিয়াছে, আজ মহাষ্টমী। শ্যামপুকুরের বাসায় ঠাকুরের নিকট অনেকগুলি ভক্ত একত্রিত হইয়া ভগবদালাপ ও ভজনাদি করিয়া আনন্দ করিতেছেন। ডাক্তারবাবুর (ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার) অপরাহ্ণ চার ঘটিকার সময় উপস্থিত হইবার কিছুক্ষণ পরেই নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) ভজন আরম্ভ করিলেন। সেই দিব্য স্বরলহরী শুনিতে শুনিতে সকলে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। ঠাকুর সমীপে উপবিষ্ট ডাক্তারকে সঙ্গীতের ভাবার্থ মৃদুস্বরে বুঝাইয়া দিতে এবং কখন বা অল্পক্ষণের জন্য সমাধিস্থ হইতে লাগিলেন। ভক্তগণের মধ্যেও কেহ কেহ ভাবাবেশে বাহ্যচৈতন্য হারাইলেন।

"ঐরূপে প্রবল আনন্দ প্রবাহে ঘর জমজম করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রাত্রি সাড়ে-সাতটা বাজিয়া গেল। ডাক্তারের এতক্ষণে চৈতন্য হইল। তিনি স্বামীজীকে পুত্রের ন্যায় স্নেহে আলিঙ্গন করিলেন এবং ঠাকুরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া দাঁড়াইবামাত্র ঠাকুরও হাসিতে হাসিতে দাঁড়াইয়া সহসা গভীর সমাধিমগ্ন হইলেন। ভক্তেরা কানাকানি করিতে লাগিলেন, 'এই সময় সন্ধি পূজা কিনা, সেই জন্য ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন। সন্ধিক্ষণের কথা না জানিয়া সহসা এই সময়ে দিব্যাবেশে সমাধিমগ্ন হওয়া অল্প বিচিত্র নহে।' প্রায় অর্ধঘণ্টা পরে তাঁহার সমাধিভঙ্গ হইল এবং ডাক্তারও বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

"ঠাকুর এইবার ভক্তগণকে সমাধিকালে যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা এইরূপে বলিতে লাগিলেন—'এখান হইতে সুরেন্দ্রের বাড়ি পর্যন্ত একটা জ্যোতির রাস্তা খুলিয়া গেল। দেখিলাম, তাহার ভক্তিতে প্রতিমায় মা'র আবেশ হইয়াছে! তৃতীয় নয়ন দিয়া জ্যোতিরশ্মি নির্গত হইতেছে! দালানের ভিতরে দেবীর সম্মুখে দীপমালা জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছে, আর উঠানে বসিয়া সুরেন্দ্র ব্যাকুল হৃদয়ে 'মা' 'মা' বলিয়া রোদন করিতেছে। তোমরা সকলে তাহার বাটীতে এখনই যাও! তোমাদের দেখিলে তাহার প্রাণ শীতল হইবে।'

"অনন্তর ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ সকলে সুরেন্দ্রনাথের বাটীতে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলেন, বাস্তবিকই দালানে ঠাকুর যে স্থানে বলিয়াছিলেন, সে স্থানে দীপমালা জ্বালা হইয়াছিল এবং তাঁহার যখন সমাধি হয়, তখন সুরেন্দ্রনাথ প্রতিমার সম্মুখে উঠানে বসিয়া প্রাণের আবেগে 'মা' 'মা' বলিয়া প্রায় এক ঘণ্টাকাল বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন

করিয়াছিলেন। ঠাকুরের সমাধিকালের দর্শন ঐরূপে বাহ্যঘটনার সহিত মিলাইয়া পাইয়া ভক্তগণ বিস্ময়ে আনন্দে হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন।"

* * *

শ্যামপুকুর পর্বে আর একটি ঘটনা, যার সঙ্গে ধর্মীয় নেতা শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী জড়িত। বিজয়কৃষ্ণের পরিচিতি ইতিপূর্বে দক্ষিণেশ্বর পর্বে দেওয়া হয়েছে।

তৎকালীন ঢাকায় অবস্থানকারী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী পশ্চিমাঞ্চলে নানা তীর্থ ভ্রমণের পর শ্যামপুকুরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করতে এসে তাঁর চরণে পতিত হন এবং সাক্ষাৎ ঈশ্বরাবতার রূপে অন্তরে গ্রহণ করেন। উচ্চআধার বিশিষ্ট বিজয়কৃষ্ণের এই ক্রিয়া ও স্বীকৃতি শ্যামপুকুর পর্বে অবতার লীলার এক নতুন প্রকাশ। কথামৃত-গ্রন্থে এই সম্পর্কে একটি সুন্দর বর্ণনায় আছে ঃ—

"কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে আসিলেন। সঙ্গে কয়েকটি ব্রাহ্ম ভক্ত। বিজয়কৃষ্ণ- ঢাকায় অনেক দিবস ছিলেন। আপাততঃ পশ্চিমে অনেক তীর্থ ভ্রমণের পর সবে কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন। আসিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। অনেকে উপস্থিত ছিলেন,—নরেন্দ্র, মহিমা চক্রবর্তী, নবগোপাল, ভূপতি, লাটু, মাষ্টার, ছোট নরেন্দ্র ইত্যাদি অনেকগুলি ভক্ত। মহিমা চক্রবর্তী (বিজয়ের প্রতি)—মহাশয়, তীর্থ ক'রে এলেন, অনেক দেশ দেখে এলেন, এখন কি দেখলেন বলুন।

বিজয়—কি ব'লবো। দেখছি, যেখানে এখন ব'সে আছি এইখানেই সব কেবল মিছে ঘোরা! কোন কোন জায়গায় এঁরই এক আনা কি দুই আনা, কোথা ও চারি আনা, এই পর্যন্ত। এইখানেই পূর্ণ ষোল আনা দেখছি।...... বিজয় (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—আপনার পীড়ার কথা শুনে দেখতে এলাম। আবার ঢাকা থেকে—

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি?

বিজয় কোন উত্তর দিলেন না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

বিজয়—ধরা না দিলে ধরা শক্ত। এইখানেই ষোল আনা।........

বিজয় (হাতজোড় করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—বুঝেছি আপনি কে! আর বলতে হবে না!

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবস্থ)—যদি তা হয়ে থাকে, তো তাই।

বিজয়—বুঝেছি।

এই বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের পাদমূলে পতিত হইলেন ও নিজের বক্ষে তাঁহার চরণ ধারণ করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন ঈশ্বরাবেশে বাহ্যশূন্য চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া আছেন।

এই প্রেমাবেশ, এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া উপস্থিত ভক্তেরা কেহ কাঁদিতেছেন, কেহ স্তব করিতেছেন। যাঁহার যে মনের ভাব, তিনি সেই ভাবে এক দৃষ্টে শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে চাহিয়া রহিলেন! কেহ তাঁহাকে পরম ভক্ত, কেহ সাধু, কেহবা সাক্ষাৎ দেহধারী ঈশ্বরাবতার দেখিতেছেন, যাঁহার যেমন ভাব।" (কথামৃত-১ম ভাগ, ষোড়শ খণ্ড-৩য় পরিচ্ছেদ)

"ইতিমধ্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে বিজয়ের সঙ্গে ভক্তদের অনেক কথাবার্তা হইতেছে।

বিজয়—কে একজন আমার সঙ্গে সদা-সর্বদা থাকেন, আমি দূরে থাকলেও তিনি জানিয়ে দেন, কোথায় কি হচ্ছে।

নরেন্দ্র—Guardian angel-এর মত।

বিজয়—ঢাকায় এঁকে (পরমহংসদেবকে) দেখেছি! গা ছুঁয়ে!

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)—সে তবে আর একজন।

নরেন্দ্র—আমিও এঁকে নিজে অনেকবার দেখেছি! (বিজয়ের প্রতি) তাই কি ক'রে বলবো—আপনার কথা বিশ্বাস করিনা!"

(কথামৃত—১ম ভাগ ষোড়শ খণ্ড-৫ম পরিচ্ছেদ)

শ্রীরামকৃষ্ণলীলায় শ্যামপুকুর পর্বে এটি একটি অলৌকিক অথচ মাধুর্যমণ্ডিত ঘটনা। তাই এটির হুবহু বিবরণ উল্লেখ করা হলো।

শ্যামপুকুর পর্বে আর একটি নতুন ঘটনা—সর্বধর্ম সমন্বয়কারী অবতারপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের যীশুরূপে আত্মপ্রকাশ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এই তাৎপর্যপূর্ণ যীশুলীলা বর্ণনার পূর্বে তাঁর এই স্বকীয় ও অভিনব লীলার পটভূমিকায় প্রবেশ করা প্রয়োজন।

প্রায় দু'হাজার বছর আগে আবির্ভূত ভগবান যীশুখৃষ্টের পূর্ণপরিচয় নূতনভাবে প্রকাশিত হয়—দু'হাজার বছর পরে দক্ষিণেশ্বরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্ম-সাধনকালে। একজনের আবির্ভাব আস্তাবলে—একজনের আবির্ভাব ঢেঁকিশালে। একজনের দেহান্ত 'ক্রুশবিদ্ধ' অবস্থায়—একজনের দেহান্ত 'ক্যান্সার বিদ্ধ' অবস্থায়। মানুষকে রক্ষার জন্যই দু'জনের দেহধারণ, আধার দেহ বিসর্জন যুগ-প্রয়োজনে। দু'জনেই যুগ-প্রবর্তক, সুন্দরতম, মঙ্গলতম, বিশুদ্ধতম, প্রিয়তম। দু'জনের বাণীই অমৃতবাণী। লৌকিক জগতে একজনের পরিচয় অমৃতের সন্তানরূপে; দু'হাজার বছর বাদে আরেকজনের পরিচয় স্বয়ং অমৃতরূপে, অবতাররূপে।

হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান—সবধর্মের সাধন ক'রেছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ লোকশিক্ষার জন্য;—সিদ্ধও হয়েছিলেন সবধর্মে। সকল ধর্মমতের সার বস্তুকে অন্তরে

গ্রহণ করেছিলেন তিনি এককজীবনে অকৃত্রিম নিষ্ঠার সঙ্গে ; জগতে এ দৃষ্টান্ত আর পাওয়া যায় না। তাই যে ধর্মের ভক্ত তাঁর কাছে এসেছিলেন, তিনিই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে তাঁর ইষ্টকে দর্শন করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণলীলার এটি একটি বৈশিষ্ট্য।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ খৃষ্টানধর্মে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তাঁর ভক্ত শম্ভুচরণ মল্লিকের দক্ষিণেশ্বরের বাগানবাড়িতে—শম্ভুচরণের কাছে 'বাইবেল' আর যীশুর পবিত্র জীবনকথা শুনে। এর অল্পদিন পরেই ঠাকুর তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন অপর ভক্ত-যদুলাল মল্লিকের দক্ষিণেশ্বরের বাগান বাড়িতে যীশুখৃষ্টের ছবি দর্শন ক'রে। আগে থেকেই যীশুর পবিত্র কথায় ভরপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন লক্ষ্য করেছিলেন যে, জীবন্ত জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল ঐ ছবি, আর সেখান থেকে প্রকাশিত জ্যোতিরশ্মি তাঁর অন্তরে প্রবেশ ক'রে লয় ক'রে দিল তাঁর জন্মগত হিন্দু সংস্কার। এরপর পরিপূর্ণ খৃষ্টীয়ভাবে তিনি দিন থাকার পর, মানসিক মহাভাবের প্রাবল্যে শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শন করলেন যীশুকে এবং প্রত্যক্ষ করলেন তাঁর নিজ শরীরে যীশুর প্রবেশ ; সঙ্গে সঙ্গে সমাধিস্থ! যীশুভাবে থাকাকালীন এই তিন দিন তিনি প্রবেশ করেন নি দক্ষিণেশ্বরে তাঁর আরাধ্যা মা-ভবতারিনীর মন্দিরে। পরবর্তীকালে, ভক্তদের কাছে যীশুর দেহের যে বর্ণনা দিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, তাতে তিনি প্রকাশ করেছিলেন যে, যীশুর নাক ছিল একটু চাপা। খৃষ্টান ধর্মের গ্রন্থাদিতে যীশুর শারীরিক বিবরণের যে তিনটি মত প্রচলিত, তার একটিতে সত্যই লিপিবদ্ধ আছে যে, তাঁর নাক ছিল চাপা। এটি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ দর্শন। আত্মিক সমুদ্রের দিশারী শ্রীরামকৃষ্ণ আত্মিক বন্ধনে বন্দী করলেন যীশুকে,—লৌকিক গুরুর সাহায্য বিনাই। শ্রীরামকৃষ্ণলীলায় এ-ও এক বিশেষ দৃষ্টান্ত! অধ্যাত্ম প্রচেষ্টা আর আত্মসম্বিতের আনন্দে আত্মহারা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন—প্রকৃত খৃষ্টধর্মের ফল-প্রাপ্তিতে পূর্ণ ; হিন্দু হয়েও তাঁর জীবনে খৃষ্টধর্মের বিকাশ স্বরূপশক্তিতে,—আত্মিক শক্তিতে। তাই দক্ষিণেশ্বরে যে ঘরে তাঁর বাস ছিল, সেখানে স্থান নিয়েছিল আর একটি ছবি—জলমগ্ন পিতরকে উদ্ধার করছেন যীশু।

শুধু যীশুকে দর্শনই নয়,—দর্শন ক'রেছিলেন যীশুর উপাসনালয়—মধ্য কলকাতার তালতলায় 'মেথডিষ্ট চার্চ' ও মধ্য কলকাতার 'বৈঠকখানা পাড়ায় হোলি ট্রিনিটি চার্চ!' বিদেশী খৃষ্টানভক্ত উইলিয়ামস্ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পেয়ে তাঁকে 'যীশুখৃষ্ট' বলে স্থির করেছিলেন এবং তাঁর শিষ্যত্বও গ্রহণ করেছিলেন। কলকাতার তদানীন্তন 'জেনারেল এসেম্বলী' কলেজের (বর্তমানে স্কটিশ চার্চ কলেজ) বিদেশী খৃষ্টান প্রিন্সিপাল রেভারেণ্ড হেষ্টিং দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের

সমাধি অবস্থা দর্শন ক'রে কলেজের ছাত্রদের কাছে সে কথা প্রকাশ করেছিলেন। ব্রাহ্মনেতা আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের বিদেশী খৃষ্টান বন্ধু রেভারেণ্ড যোশেফ কুক্ ও বিদেশিনী পাদ্রী মিস্ পিগট্ও একদা দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গাবক্ষে ষ্টীমারের ভিতরেই ঠাকুরের সমাধি দর্শন ক'রে স্তম্ভিত হয়েছিলেন। কলকাতার মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডাঃ কোট্স কাশীপুর উদ্যানবাটীতে ঠাকুরের চিকিৎসা উপলক্ষে ঠাকুরকে পরীক্ষা করার পর, ঠাকুরের সমাধিস্থ অবস্থা দর্শন ক'রে বাইবেলে বর্ণিত যীশুর সঙ্গে তাঁর একই অবস্থা ব'লে অভিমত প্রকাশ ক'রেছিলেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা—দক্ষিণেশ্বরে এক কুষ্ঠরোগীকে যীশুর মতই নীরোগ করা। একদা এক কুষ্ঠরোগী দক্ষিণেশ্বরে কাতরভাবে প্রার্থনা করলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তাঁর রোগ মুক্তির জন্য। চিরদিন সবরকম সিদ্ধাইয়ের বিরোধী শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম-দিকে রাজী হলেন না তাঁর প্রার্থনায়, কিন্তু তাঁর প্রবল কাতরতায় আর বিশ্বাসে আকৃষ্ট হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। করুণাময় যীশুর মতই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অমৃত হস্তের স্পর্শে নিরাময় করলেন তাঁকে। সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন পরিপূর্ণ যীশুভাবে।

উপরোক্ত পটভূমিকায় শ্যামপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণের যীশুভাবে আত্মপ্রকাশের দিনটি স্মরণীয়। ১৮৮৫ সালের ৩১শে অক্টোবর শ্যামপুকুর বাটীতে ঠাকুরের মধ্যে যীশুর ভাবের বিকাশ ঘটেছিল এবং তার পাঁচদিন পরেই অর্থাৎ এক সপ্তাহের মধ্যেই ৬ই নভেম্বর কালীপূজার দিনে এই বাটীতেই ভক্তসমক্ষে তাঁর ভেতর সাক্ষাৎ জগন্মাতার আবির্ভাব হয়েছিল। যীশুর ভাবের বিকাশটি সর্বসমক্ষে ঘটলেও, সেদিন সেখানে উপস্থিত একমাত্র খৃষ্টান সাধু প্রভুদয়াল মিশ্রই তা প্রত্যক্ষ করেন এবং ঠাকুরের কৃপা লাভ ক'রে কৃতার্থ হন ; অর্থাৎ যীশুর ভাব অনুধাবন করার ক্ষমতা হিন্দু অপেক্ষা খৃষ্টান ভক্তের মধ্যেই থাকা স্বাভাবিক।

এই বিশেষ দিনের ও বিশেষভাবের ঘটনা 'কথামৃত' গ্রন্থে যেমনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তার কিছু অংশের উদ্ধৃতি :—

"ঠাকুর ভক্ত সঙ্গে বসিয়া আছেন। বেলা এগারটা। মিশ্র নামক একটি খৃষ্টান ভক্তের সহিত কথা কহিতেছেন। মিশ্রের বয়ঃক্রম ৩৫ বৎসর হইবে। মিশ্র খৃষ্টান বংশে জন্মিয়াছেন। যদিও সাহেবের পোষাক, ভিতরে গেরুয়া আছে। এখন সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। ইহার জন্মস্থান পশ্চিমাঞ্চলে। একটি ভ্রাতার বিবাহের দিনে তাঁহার এবং আর একটি ভ্রাতার একদিনে মৃত্যু হয়। সেই দিন হইতে মিশ্র সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি কোয়েকার সম্প্রদায়ভুক্ত।

মিশ্র—'ওহি রাম ঘট্ ঘটমে লেটা'।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট নরেনকে আস্তে আস্তে বলিতেছেন—যাহাতে মিশ্রও শুনিতে পান—'এক রাম তাঁর হাজার নাম'। খৃষ্টানরা যাঁকে 'গড্' বলে, হিন্দুরা তাঁকেই রাম, কৃষ্ণ, ঈশ্বর—এই সব বলে। পুকুরে অনেকগুলি ঘাট। এক ঘাটে হিন্দুরা জল খাচ্ছে, বলছে জল, ঈশ্বর। খৃষ্টানেরা আর এক ঘাটে খাচ্ছে—বলছে ওয়াটার, গড যীশু! মুসলমানেরা আর এক ঘাটে খাচ্ছে—বলছে, পানি, আল্লা।

মিশ্র—মেরীর ছেলে যীশু নয়। যীশু স্বয়ং ঈশ্বর। (ভক্তদের প্রতি) ইনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) এখন এই আছেন—আবার এক সময় সাক্ষাৎ ঈশ্বর। আপনারা (ভক্তেরা) এঁকে চিনতে পাচ্ছেন না। আমি আগে থেকে এঁকে দেখেছি—এখন সাক্ষাৎ দেখছি। দেখেছিলাম—একটি বাগান, উনি উপরে আসনে ব'সে আছেন; মেজের উপর আর একজন ব'সে আছেন;—তিনি তত উন্নত নন। এই দেশে চারজন দ্বারবান আছেন। বোম্বাই অঞ্চলে তুকারাম ও কাশ্মীরে রবার্ট মাইকেল; —এখানে ইনি;—আর পূর্বদেশে আর একজন আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি কিছু দেখতে টেকতে পাও?

মিশ্র—আজ্ঞা, বাটীতে যখন ছিলাম তখন থেকে জ্যোতিঃদর্শন হত। তারপর যীশুকে দর্শন করেছি। সে রূপ আর কি বলব!—সে সৌন্দর্যের কাছে কি স্ত্রীর সৌন্দর্য!

কিয়ৎক্ষণ পরে ভক্তদের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে মিশ্র জামা পেণ্টলুন খুলিয়া ভিতরের গেরুয়ার কোপীন দেখাইলেন।

ঠাকুর বারান্দা হইতে আসিয়া বলিতেছেন—'বাহ্যে হলো না—এঁকে (মিশ্রকে) দেখলাম, বীরের ভঙ্গী ক'রে দাঁড়িয়ে আছে'।

এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইতেছেন। পশ্চিমাস্য হইয়া দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ।

কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া মিশ্রকে দেখিতে দেখিতে হাসিতেছেন। এখনও দাঁড়াইয়া। ভাবাবেশে মিশ্রকে শেক্হ্যাণ্ড (হস্তধারণ) করিতেছেন ও হাসিতেছেন। হাত ধরিয়া বলিতেছেন—'তুমি যা চাইছ তা হয়ে যাবে'।

ঠাকুরের বুঝি যীশুর ভাব হইল! তিনি আর যীশু কি এক?

মিশ্র (করজোড়ে)—আমি সেদিন থেকে মন, প্রাণ, শরীর,—সব আপনাকে দিয়েছি!

ঠাকুর ভাবাবেশে হাসিতেছেন। ঠাকুর উপবেশন করিলেন। মিশ্র ভক্তদের কাছে তাঁর পূর্বকথা সব বর্ণনা করিতেছেন। তাঁহার দুইভাই বরের

সভায় সামিয়ানা চাপা পড়িয়া, মানবলীলা সম্বরণ করিলেন,—তাহাও বলিলেন। ঠাকুর মিশ্রকে যত্ন করিবার কথা ভক্তদের বলিয়া দিলেন।"

(কথামৃত—৪র্থ ভাগ, ত্রিংশ খণ্ড—২য় পরিচ্ছেদ)

উপরোক্ত ঘটনায় প্রমাণিত হয়, খৃষ্টান ভক্তকে দর্শন ক'রেই ঠাকুরের ভিতরকার যীশুভাবটি আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং এটি প্রকৃতপক্ষে যীশুভাবের আবেশ-অবতার।

* * *

এই ঘটনার পরেই ১৮৮৫ সালের ৬ই নভেম্বরের অভূতপূর্ব ঘটনা, যা ঠাকুরের শক্তি-সমন্বিত প্রেম ও করুণা প্রকাশের লীলা। এদিন কালীপূজার রাত্রে ভক্তেরা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ জগদম্বা জ্ঞানে পূজা ক'রেছিলেন, আর তিনি সমাহিত অবস্থায় জগদম্বা ভাবে একহাতে 'বর' এবং অন্যহাতে 'অভয়' প্রদান করেছিলেন। পরবর্তীকালে কাশীপুর উদ্যানবাটিতে ১৮৮৬ সালের ১লা জানুয়ারী 'কল্পতরু' রূপে ঠাকুরের যে দিব্যভাবের বিশেষ প্রকাশ ঘটেছিল, প্রকৃতপক্ষে এখানেই কালীপূজার রাত্রে ছিল তার যেন প্রস্তুতিপর্ব, যা শ্যামপুকুর অধ্যায়ে একটি বিশিষ্ট দৈবলীলা।

এ সম্পর্কে স্বামী সারদানন্দ তাঁর 'লীলাপ্রসঙ্গ'-গ্রন্থের ৫ম খণ্ডে উল্লেখ ক'রেছেন :—"দুর্গাপূজার ন্যায় কালীপূজার সময়েও ঠাকুরের ভিতরে অদ্ভুত আধ্যাত্মিক প্রকাশ ভক্তগণের নয়ন গোচর হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ কোন সময়ে প্রতিমা আনয়ন পূর্বক কালীপূজা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ঠাকুর ও তাঁহার ভক্তগণের সম্মুখেই ঐ সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিতে পারিলে পরম আনন্দ হইবে ভাবিয়া তিনি শ্যামপুকুরের বাটীতে উক্ত পূজা করিবার কথা পাড়িলেন। কিন্তু পূজার উৎসাহ, উত্তেজনা ও গোলমালে ঠাকুরের শরীর অধিকতর অবসন্ন হইবে ভাবিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে ঐরূপ কার্য হইতে বিরত হইবার পরামর্শ প্রদান করিল। দেবেন্দ্র ভক্তগণের কথা যুক্তিযুক্ত ভাবিয়া ঐ সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন। ঠাকুর কিন্তু পূজার পূর্বদিবসে কয়েকজন ভক্তকে সহসা বলিয়া বসিলেন, 'পূজার উপকরণ সকল সংক্ষেপে সংগ্রহ করিয়া রাখিস্—কাল কালীপূজা করিতে হইবে। তাহারা তাঁহার ঐ কথায় আনন্দিত হইয়া অন্য সকলের সহিত ঐ বিষয়ে পরামর্শ করিতে বসিল। কিন্তু পূর্বোক্ত কথাগুলি ভিন্ন, পূজার আয়োজন সম্বন্ধে অন্য কোন কথা ঠাকুরের নিকট না পাওয়ায়,—কি ভাবে উহা সম্পন্ন করিতে হইবে, তদ্বিষয় লইয়া নানা জল্পনা তাহাদিগের মধ্যে উপস্থিত হইল। পূজা ষোড়শোপচারে অথবা পঞ্চোপচারে হইবে, উহাতে অন্নভোগ দেওয়া হইবে কিনা, পূজকের পদ কে

গ্রহণ করিবে ইত্যাদি বিষয়ের কোন মীমাংসা না করিতে পারিয়া অবশেষে স্থির হইল—গন্ধ পুষ্প, ধূপ, দীপ, ফলমুল এবং মিষ্টান্নমাত্র সংগ্রহ করিয়া রাখা হউক, পরে ঠাকুর যেরূপ বলেন, করা যাইবে। কিন্তু সেই দিবস এবং পূজার দিনের অর্ধেক অতীত হইলেও ঠাকুর ঐ সম্বন্ধে আর কোন কথা তাহাদিগকে বলিলেন না।

"ক্রমে সূর্যাস্ত হইয়া রাত্রি প্রায় ৭টা বাজিয়া গেল। ঠাকুর তখনও তাহাদিগকে পূজা সম্বন্ধে কিছুই না বলিয়া অন্যদিবসের ন্যায় স্থিরভাবে শয্যায় বসিয়া আছেন দেখিয়া তাহারা তাঁহার সন্নিকটে পূর্ব দিকের কতকটা স্থান মার্জনা করিয়া সংগৃহীত দ্রব্য সকল আনিয়া রাখিতে লাগিলেন। দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে গন্ধ পুষ্পাদি পূজোপকরণ লইয়া ঠাকুর কখনও কখনও আপনাকে আপনি পূজা করিতেন। ভক্তগণের কেহ কেহ উহা দেখিয়াছিল। অদ্যও সেইরূপে তিনি নিজ দেহমনরূপ প্রতীকাবলম্বনে জগচ্চৈতন্য ও জগচ্ছক্তিরূপিনীর পূজা করিবেন, অথবা—৺জগদম্বার সহিত অভেদ জ্ঞানে শাস্ত্রোক্ত আত্মপূজা সম্পন্ন করিবেন, তাহারা পরিশেষে এই মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিল। সুতরাং পূজোপকরণ সকল তাহারা এখন ঠাকুরের শয্যাপার্শ্বে পূর্বোক্তরূপে সাজাইয়া রাখিবে, ইহা বিচিত্র নহে! ঠাকুর তাহাদিগকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া কোনরূপ অসম্মতি প্রকাশ করিলেন না।

"ক্রমে সকল উপকরণ আনয়ন করা হইল এবং ধূপ দীপসকল প্রজ্বলিত হওয়ায় গৃহ আলোকময় ও সৌরভে আমোদিত হইল। ঠাকুর তখনও স্থির হইয়া বসিয়া আছেন দেখিয়া ভক্তগণ এখন তাঁহার নিকটে উপবেশন করিল এবং কেহ বা তাঁহার আদেশ প্রতীক্ষা করিয়া একমনে তাঁহাকে দেখিতে এবং কেহ বা জগজ্জননীর চিন্তা করিতে লাগিল। ঐরূপ গৃহ এককালে নীরব এবং ত্রিশ বা ততোধিক ব্যক্তি উহার অন্তরে অবস্থান করিলেও জনশূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কতক্ষণ ঐরূপে অতীত হইল, ঠাকুর কিন্তু তখনও স্বয়ং পূজা করিতে অগ্রসর হওয়া অথবা আমাদিগের কাহাকেও ঐ বিষয়ে আদেশ করা, কিছুই না করিয়া পূর্বের ন্যায় নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া রহিলেন।

"যুবক ভক্তগণের সহিত মহেন্দ্রনাথ, রামচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি প্রধান ভক্ত সকল উপস্থিত ছিলেন—তন্মধ্যে গিরিশচন্দ্রের 'পাঁচসিকে পাঁচ আনা' বিশ্বাস বলিয়া—ঠাকুর কখন কখন নির্দেশ করিতেন। পূজা সম্বন্ধে ঠাকুরকে ঐরূপ ব্যবহার করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগের অনেকে এখন বিস্মিত হইতে লাগিলেন। ঠাকুরের প্রতি অসীম বিশ্বাসবান গিরিশচন্দ্রের প্রাণে কিন্তু উহাতে অন্যভাবের উদয় হইল। তাঁহার মনে হইল, আপনার জন্য ঠাকুরের ৺কালীপূজা

করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যদি বল, অহেতুকী ভক্তির প্রেরণায় তাঁহার পূজা করিবার ইচ্ছা হইয়াছে—তাহা হইলে উহা না করিয়া এরূপে স্থির হইয়া বসিয়া আছেন কেন? অতএব তাহাও বোধ হইতেছে না; তবে কি তাঁহার শরীররূপ জীবন্ত প্রতিমায় জগদম্বার পূজা করিরা ভক্তগণ ধন্য হইবে বলিয়া এই পূজায়োজন?—নিশ্চয় তাহাই। ঐরূপ ভাবিয়া তিনি উল্লাসে অধীর হইলেন এবং সম্মুখস্থ পুষ্পচন্দন সহসা গ্রহণপূর্বক 'জয় মা' বলিয়া ঠাকুরের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিলেন। ঠাকুরের সমস্ত শরীর উহাতে শিহরিয়া উঠিল এবং তিনি গভীর সমাধিমগ্ন হইলেন! তাঁহার মুখমণ্ডল জ্যোতির্ময় এবং দিব্যহাস্যে বিকশিত হইয়া উঠিল এবং হস্তদ্বয় বরাভয় মুদ্রা ধারণ পূর্বক তাঁহাতে ৺জগদম্বার আবেশের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল। এত অল্পকালের মধ্যে এই সকল ঘটনা উপস্থিত হইল যে, পার্শ্ববর্তী ভক্তগণের অনেকে ভাবিল, ঠাকুরকে ঐরূপ ভাবাবিষ্ট হইতে দেখিয়াই গিরিশ তাঁহার শ্রীপদে বারংবার অঞ্জলি প্রদান করিতেছেন এবং যাহারা কিঞ্চিৎদূরে ছিল, তাহারা দেখিল যেন ঠাকুরের শরীরাবলম্বনে জ্যোতির্ময়ী দেবী প্রতিমা সহসা তাহাদিগের সর্ম্মুখে আবির্ভূ্তা হইয়াছেন!

"বলা বাহুল্য, ভক্তগণের প্রাণে এখন উল্লাসের অবধি রহিল না। তাহারা প্রত্যেকে কোনরূপে পুষ্পপাত্র হইতে ফুলচন্দন গ্রহণ করিয়া যাহার যেরূপ ইচ্ছা মন্ত্র উচ্চারণ ও ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম পূজাপূর্বক 'জয় জয়' রবে গৃহ মুখরিত করিয়া তুলিল। কতক্ষণ ঐরূপে গত হইলে ভাবাবেশের উপশম হইয়া ঠাকুরের অর্ধবাহ্য অবস্থা উপস্থিত হইল। তখন পূজার নিমিত্ত সংগৃহীত ফলমূলমিষ্টান্নাদি পদার্থসকল তাঁহার সম্মুখে আনয়ন করিয়া তাঁহাকে খাইতে দেওয়া হইল। তিনিও ঐ সকলের কিছু কিছু গ্রহণ করিয়া ভক্তি ও জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য ভক্তগণকে আশীর্বাদ করিলেন। অনন্তর তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ করিয়া গভীর রাত্রি পর্যন্ত তাহারা সকলে প্রাণের উল্লাসে ৺দেবীর মহিমা কীর্তন ও নামগুণ-গানে অতিবাহিত করিল।"

* * *

ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্ত রচিত 'পরমহংসদেবের জীবন বৃত্তান্ত' গ্রন্থ থেকে এই বিষয়ে আরো জানা যায়:—"মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়কে তিনি গুপ্তভাবে কহিয়াছিলেন, 'কালীপূজার দিনটি বিশেষ দিন। সেদিনে মাতার পূজা হওয়া উচিত'। গুপ্ত মহাশয় কালীপদ ঘোষের নিকট তাহা ব্যক্ত করেন। কালীপদ গিরিশবাবুর দলস্থ একজন ব্যক্তি, পরমহংসদেব কর্তৃক পরিবর্তিত হইয়াছিলেন। তিনি তদবধি একজন প্রধান ভক্ত বলিয়া পরিগণিত। পরমহংসদেবের প্রতি তাঁহার ভক্তি অনুকরণীয়। তিনি পরমহংসদেবের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। কালীপদ এই কথা

শুনিয়া কালীপূজার রীতিমত আয়োজন করিয়াছিলেন। দীপমালায় বাটী আলোকিত করিলেন এবং সন্ধ্যার পর ধূপ, দীপ, ফুল, বিল্বপত্র, গঙ্গাজল এবং সুজি, লুচি ও মিষ্টান্নাদি পরমহংসদেবের সম্মুখে সাজাইয়া দিলেন।"

অর্থাৎ ভক্তপ্রবর কালীপদ ঘোষ শুধু যে শ্যামপুকুরের বাটীতে অসুস্থ ঠাকুরের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন তাই নয়, সেদিনের এই অভিনব পূজার আয়োজকও ছিলেন। ভক্তকবি অক্ষয়কুমার সেনও তাঁর "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি'তে কালীপদের এদিনের আয়োজন সম্পর্কে জানিয়েছেন :—

"হেথা ভক্তিমতী ঘরে গৃহিনী তাঁহার।
ভোজ্যাদি নিজের হাতে করেন তৈয়ার॥
ফুলুকা ফুলুকা লুচি সুজির পায়েস।
নূতন খেজুর-গুড়ে গোল্লা সন্দেশ॥
সাদা সন্দেশাদি আর মিষ্টান্ন বহুল।
বিল্বপত্র গঙ্গাজল ধূপদীপ ফুল॥
যাবতীয় দ্রব্যাদি জোগাড় করি ঘরে।
শুভক্ষণে দিলা আনি প্রভুর গোচরে॥
অপর দ্রব্যাদি কালী আনিলা আপনি।
সুজির পায়েস আনে তাঁহার গৃহিনী॥"

ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য তাঁর রচিত 'ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ'-গ্রন্থে জানিয়েছেন :— "কালীপদের বাড়ি ছিল শ্যামপুকুরে; তিনি ঠাকুর ও তাঁহার সেবকদের তত্ত্বাবধান করিতেন বলিয়া ঠাকুর তাঁহাকে ম্যানেজার বলিতেন। আর নরেন্দ্র তাঁহার নাম দিয়াছিলেন 'দানা'। দানা-কালী কালীপূজার যাবতীয় দ্রব্য যোগাড় করিয়া আনিয়াছিলেন।...সুজির পায়েস প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলেন দানা-কালীর কনিষ্ঠা ভগিনী মহামায়া। গৃহিনীর মাথাগরম ছিল বলিয়া তাঁহার পক্ষে এই কাজ সম্ভব ছিল না। শ্রীমতী মহামায়া মিত্রের সঙ্গে একসময়ে আমাদের ঘনিষ্ঠতা ছিল।"

উপরের বিবরণগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ভক্ত কালীপদ ঘোষ সম্পর্কে কিছু জানা দরকার; কারণ, পূর্বেই বলা হয়েছে যে, অসুস্থ ঠাকুরের তত্ত্বাবধায়করূপে এবং শ্যামপুকুরবাটীতে এই অভিনব কালীপূজার সকলপ্রকার আয়োজনে তাঁর প্রধান ভূমিকা ছিল।

* * *

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত গৃহীশিষ্য কালীপদ ঘোষ ১৮৪৯ সালে

উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুরে প্রসিদ্ধ ঘোষ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র অষ্টম শ্রেণী অবধি পড়ার পর তিনি 'জন্‌ডিকিন্‌স্' নামক এক বিলাতী কোম্পানীর অফিসে চাকরী গ্রহণ করেন এবং ক্রমে ক্রমে সেখানকার সর্বোচ্চ পদ লাভ করেন। নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে তাঁর খুব হৃদ্যতা থাকায়, প্রথম জীবনে দু'জনে একইসঙ্গে সুরাপানে মত্ত থাকতেন; এজন্য গিরিশচন্দ্র ও কালীপদকে সাধারণ লোকে 'জগাই-মাধাই' বলত, আর এই দানবীয় প্রকৃতির জন্য স্বামী বিবেকানন্দ কৌতুকভরে কালীপদকে 'দানাকালী' বলতেন।

কালীপদর দিন দিন অশান্ত জীবন লক্ষ্য ক'রে তাঁর ভক্তিমতী স্ত্রী একদা দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এই কদাচার থেকে তাঁর স্বামীকে রক্ষা করার জন্য প্রার্থনা জানান এবং কৃপাময় ঠাকুরও তাঁর প্রার্থনা সফল করার জন্য প্রতিশ্রুতি দেন। এমনকি, ঠাকুর তাঁকে জানান—'কালী এখানকারই লোক, সুতরাং একদিন ওর মতিগতি ফিরবেই।'

বন্ধু গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে কালীপদ প্রথম যেদিন দক্ষিণেশ্বরে যান, সেদিন তিনি ঠাকুরকে প্রণাম না ক'রেই কিছুক্ষণের জন্য ব'সে থেকে সেখান থেকে বিদায় নিয়ে চ'লে আসেন; কিন্তু পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার জন্য সহসা তাঁর প্রাণ ব্যাকুল হওয়ায়, তিনি একদা নিজেই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে গিয়ে উপস্থিত হন। ঠিক সেই সময়েই ঠাকুর কলকাতায় আসার জন্য গঙ্গায় নৌকাতে আরোহণ করার সময়, কালীপদকেও সেই নৌকায় তুলে নেন। সেদিন গঙ্গাবক্ষে নৌকার ভেতরেই ভাগ্যবান কালীপদর জিহ্বায় আঙুল দিয়ে কিছু লিখে ঠাকুর তাঁকে বিশেষ কৃপাদান করেন এবং সেইদিনই অযাচিতভাবে কালীপদর শ্যামপুকুরের বাড়িতে ঠাকুর প্রথম শুভাগমন ক'রে পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আসেন। (শ্যামপুকুরে কালীপদ ঘোষের এই বাড়ির ঠিকানা—২০নং শ্যামপুকুর লেন, কলি-৪)। উক্ত ঘটনার পর থেকেই কালীপদর স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয় এবং তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ত ও শিষ্যরূপে পরিগণিত হন। কাশীপুরে 'কল্পতরু' হওয়ার দিনেও কালীপদর বক্ষ স্পর্শ ক'রে ঠাকুর তাঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন।

ঠাকুরের দেহরক্ষার পর কালীপদ কাঁকুড়গাছির 'যোগোদ্যান'-এর সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত হন এবং ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের সঙ্গেও নিবিড় সম্পর্ক বজায় রাখেন। ১৯০৫ সালের ২৮শে জুন কালীপদ দেহত্যাগ করেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, কালীপদর বাড়ি থেকে শ্যামপুকুরবাটীতে সেই অভিনব কালীপূজার রাত্রে ঠাকুরের জন্য সুজির পায়েস ক'রে পাঠানোর পুণ্যময় স্মৃতি

রক্ষার্থে, বর্তমানে প্রতিবছর এই শ্যামপুকুর বাটীতে কালীপূজার দিনে ঠাকুরের 'বরাভয়' মূর্তি পূজা উপলক্ষে কালীপদ ঘোষের বংশধরগণ সেই প্রথা বজায় রেখেছেন।

* * *

এখন আবার এই কালীপূজার রাত্রে ঠাকুরের 'বরাভয়'-লীলা প্রসঙ্গে ফিরে আসি। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি', 'পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত' 'লীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থাদিতে এই দিনের ঘটনার বিভিন্ন বর্ণনা ছাড়াও 'কথামৃত'-গ্রন্থের তৃতীয়ভাগে এই সম্পর্কে যে বাড়তি উপাদান সংগৃহীত হয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, ঠাকুর সেদিন ভক্তদের "ধ্যান" করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং গিরিশাদি ভক্তবৃন্দ কর্তৃক ঠাকুরের পাদপদ্মে মালা দেবার সময় ঠাকুরের ত্যাগী সন্তান স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ঠাকুরের চরণে ফুল দিয়ে 'ব্রহ্মময়ী' 'ব্রহ্মময়ী' ধ্বনিতে তাঁকে বন্দনা ক'রে ভূমিষ্ট প্রণাম ক'রেছিলেন। এরপর ভক্তেরা স্তব ও সঙ্গীত দ্বারা ঘরটি মুখরিত ক'রেছিলেন। সেদিন পর পর অনেকগুলি স্তব ও সঙ্গীতের উল্লেখ পাওয়া যায়;

যথা— 'কে রে নিবিড় নীল কাদম্বিনী সুরসমাজে'
'দীনতারিণী' দুরিতহারিণী, সত্ত্বরজস্তম ত্রিগুণধারিণী'
'মনেরি বাসনা শ্যামা শবাসনা শোন মা বলি'
'সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি'
'তোমারি করুণায় মা সকলি হইতে পারে'
'গো আনন্দময়ী হয়ে মা আমায় নিরানন্দ ক'রো না'
'নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি'
'কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্যামা সুধাতরঙ্গিনী'
'শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা'।

এইভাবে সেদিন প্রাণের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে ভক্তগণ মহানন্দে প্রমত্ত হন এবং ঠাকুরের প্রদত্ত প্রসাদ গ্রহণ ক'রে সবাই ধন্য হন।

ঠাকুরের ভক্ত ও কবি অক্ষয়কুমার সেন তাঁর রচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি'-গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার কিছু অংশ উল্লেখ ক'রে এবার কালীপূজার রাত্রে ঠাকুরের লীলাবিলাসের কাহিনী শেষ করব।

যথাঃ—"আনন্দের স্রোতেতে আনন্দ বাড়াবাড়ি।
সকলে প্রসাদ লয়ে করে কাড়াকাড়ি॥
শ্রীপদে অঞ্জলি দেয়া কুসুমের হার।
কেহ উঠাইয়া গলে পরে আপনার॥

কেহ-বা সঞ্চয় হেতু বাঁধিল বসনে।
কেহ-বা গরবভরে পরে দুইকানে॥
কেহ-বা ঢলিয়া পড়ে অপরের গায়।
হৃদয়ে আনন্দ এত ধরে না তাহায়॥
কি রঙ্গ হইল দৃশ্য কার সাধ্য কয়।
চক্ষে দেখা তবু তিল বর্ণিবার নয়॥"

* * *

প্রকৃতপক্ষে, সেদিন জগন্মাতা কালীর আবেশেই ঠাকুর 'বরাভয়' মূর্তি ধারণ ক'রেছিলেন। নিজেকে সব সময় প্রচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা ক'রেও মাঝে মাঝে তিনি লীলাচ্ছলে নিজ অবতারত্বের কথা বিস্মরণ হয়ে আত্মপ্রকাশ ক'রে ফেলতেন; এমন দৃষ্টান্ত তাঁর লীলাবিলাসের মধ্যে আগেও পাওয়া যায়। বাল্যাবস্থায় মা-বিশালাক্ষী ভাবে সমাধি, পাইনদের বাড়িতে শিবরাত্রির দিনে শিবরূপে সমাধি, ভক্ত মথুরামোহন বিশ্বাসকে 'শিবকালী'রূপ প্রদর্শন, খৃষ্টান ভক্ত প্রভুদয়াল মিশ্রকে যীশুভাবে কৃপা, কলুটোলার হরিসভায় 'চৈতন্যআসনে' শ্রীচৈতন্যরূপে অবস্থান প্রভৃতি নানাভাবে রসময় ঠাকুর ভক্তদের বিভিন্ন অধ্যাত্মরসে সিক্তিত করেছেন। সবশেষে, কাশীপুর উদ্যানবাটীতে সরাসরি আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে এবং বিশ্বরূপ-দর্শনের বিভূতিযোগে সমগ্র জীবকুলকে অযাচিত কৃপা ক'রে স্বধামে প্রত্যাবর্তন ক'রেছেন। তাই শ্যামপুকুর পর্বে, জগন্মাতা কালীরূপে ভক্তদের সম্মুখে ঠাকুরের আত্মপ্রকাশ স্বাভাবিকভাবেই ঘটেছিল। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ঠাকুরের পরমভক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল তাঁর রচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত' গ্রন্থে 'শ্রীকালী' ও 'রামকৃষ্ণ-কালী' বিষয়ক বিশেষ তত্ত্বটি প্রকাশ ক'রেছেন, যথা:—"আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সকলকেই কলন করেন বলিয়াই কাল। সেই কালকে নিগ্রহ করিয়া যিনি আনন্দে নৃত্য করেন, তিনিই কালী। অরূপা হইয়াও যাঁর রূপ-কল্পনা,—তিনিই মেঘবরণা শ্যামা। অবিরাম বিশ্বপ্রসবে উলঙ্গিনী অথবা বালিকার মতো লীলা-বিলাসে উন্মত্তা, তাই উলঙ্গিনী। সৃষ্টি-স্থিতি-পালনে দয়ার্দ্রচিত্তে সুখ প্রসন্ন বদনা, বরাভয়করা। আবার সংহার-বাসনায় করালবদনা ও অসিমুণ্ডধরা। যখন কিছুই ছিল না, কেবল আপনিই বর্তমান, তখনও বিদ্যার বীজস্বরূপ বর্ণমালাই মুণ্ডমালা রূপে মায়ের গলায় শোভমান। নানা বর্ণ, অর্থাৎ নাম, রূপ ভাবকে নিজ নিজ অঙ্গে লীন করিবেন, তাই বুঝি আঁধার-বরণ্য। ভক্তের জন্ম-মরণ-দক্ষিণান্ত করিতে মুক্তকেশী দক্ষিণ চরণখানি বাড়াইয়া দিয়াছেন। সন্তান-কল্যাণে বিপরীত আচরণে, অর্থাৎ বামা হইয়াই দক্ষিণপদ প্রসার, তাই বুঝি লজ্জায়

মৃদুহাস্যে দশনে জিহ্বা চাপিতেছেন। ফলতঃ একাধারে এমন সৌম্যা ও ভীমা ভাবের প্রকাশ, যেন পরব্রহ্মের পূর্ণবিকাশ বলিয়া বোধ হয়। যিনি এতই মহিমময়ী, কিরূপে তাঁর দিব্যদর্শন লাভ হইবে,—তাই বুঝি অভয়। শবাসনা হইয়া দেখাইতেছেন যে, শিবের মতো হৃদয় শব, অর্থাৎ নির্বিকল্প হইলে, তবে তাহাতে তাঁহার উদয় হইবে। এই আলোক আঁধাররূপা আত্মামাতার শ্রীচরণে যাহারা আশ্রয় লয়, তাহারা যে জাতি বা বর্ণ হউক না কেন, কিংবা যে রকম আচরণ করুক না কেন, তাঁহার কাছে সকলের মান, তুলামানে সমান মান হয়। তাই তুলারাশি অমানিশায় ব্রহ্মময়ীর আবির্ভাব ঘোষণা করিতেছে। সুতরাং তাঁহার অর্চনায় কৈবল্য নিশ্চিত জানিয়া সকলেই এই কৈবল্যদায়িনীর পূজার আগ্রহ করিয়া থাকে।……দিব্যভাবে ভাবিত ঠাকুর অমনিই প্রসন্নবদনা ও বরাভয় করা হইয়া এক অপূর্ব জ্যোতিতে আত্মপ্রকাশ করিলেন। তখন আমরা সকলে পাদপদ্মে অঞ্জলি দিয়া কৃতার্থ বোধ করিলাম। ফলতঃ প্রভুর এমন আনন্দঘনরূপ আমরা ইতিপূর্বে দর্শন করি নাই। এরূপ বর্ণনার অতীত, কেবল ধ্যানেরই উপভোগ্য।"

* * *

এইভাবে শ্যামপুকুরপর্বে ঠাকুরের নানা লীলাবিলাস ঘটলেও, মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করা হল। শ্যামপুকুর বাটী সম্পর্কে ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত তাঁর 'পরমহংসদেবের জীবন বৃত্তান্ত' গ্রন্থের একস্থানে উল্লেখ ক'রেছেন—"এইরূপে শ্যামপুকুরের বাটীতে তিনি তিন মাস** অতিবাহিত করেন। চিকিৎসায় উপকার হউক আর না হউক, প্রচার কার্য বিশিষ্ট রূপে হইত। দিবারাত্রি নৃত্য, গীত, ঈশ্বরালোচনায় কাটিয়া যাইত। এইস্থানে প্রত্যহই অদ্ভুত ঘটনা দেখা যাইত, সে সকল লিপিবদ্ধ করিতে যাইলে একজনের জীবনের সঙ্কুলান হইতে পারে না।"

সুতরাং অনুমান করা যায় যে, শ্যামপুকুর বাটীতে ঠাকুরের কত লীলাই না হয়েছে! তাই এই 'শ্যামপুকুর বাটী' অবতার পুরুষের লীলাসম্বন্ধে পূর্ণ, পুন্য ও মহাপবিত্র! এখানে কত ভগবৎ প্রসঙ্গ হয়েছে, কত ভক্ত ও পার্ষদদের আগমন ঘটেছে, কত নূতন নূতন বিচিত্র লীলার সমাবেশ হয়েছে, আবার কত ভাবসমাধিও ঘটেছে। ভক্তের হৃদয় যেমন ভগবানের বৈঠকখানা, গোকুল ভট্টাচার্যের এই বৈঠকখানা ছিল তেমন ভগবানের বিশ্রামাগার। এই বিশ্রামাগারে ভগবানের লীলাস্মৃতির সঙ্গে আরো যাঁদের পবিত্র স্মৃতি জড়িয়ে আছে, তাঁরা হলেন—শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ, স্বামী রাম-

** প্রকৃতপক্ষে ৭০ দিন।

কৃষ্ণানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ প্রভৃতি ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ও লীলাপার্ষদগণ; আরো যাঁদের স্মৃতি এখানে বিশেষভাবে জড়িত, তাঁরা হলেন—কথামৃত-প্রণেতা মাষ্টার মশাই শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, নাট্যাচার্য ও ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র ঘোষ, প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ বিহারীলাল ভাদুড়ী, প্রখ্যাত চিত্রকর অন্নদা বাগ্‌চী, প্রখ্যাত লেখক রাজকৃষ্ণ রায়, প্রখ্যাত অভিনেত্রী শ্রীমতী বিনোদিনী, খৃষ্টান ধর্মযাজক প্রভুদয়াল মিশ্র, ভক্তিমতী গোলাপ-মা প্রভৃতি। এ ছাড়াও আস্‌তেন ভক্ত ও অনুরাগীবৃন্দ;—যেমন ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মহিমাচরণ চক্রবর্তী, নবগোপাল ঘোষ, কালীপদ ঘোষ (দানাকালী), কালীপদের কনিষ্ঠা ভগিনী মহামায়া দেবী, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ (ঠাকুর গৃহীভক্তদের মধ্যে একমাত্র যাঁকে 'ঈশ্বরকোটী' বলতেন), রামচন্দ্র দত্ত, বলরাম বসু, চুনীলাল বসু, হরিবল্লভ বসু, সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল, মনীন্দ্র গুপ্ত, মনোমোহন মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, সুরেশচন্দ্র দত্ত, নিত্যগোপাল (পরবর্তীকালে মহানির্বাণ মঠের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী জ্ঞানানন্দ অবধূত), ছোট নরেন, পল্টু, ভূপতি, রামতারণ, অধ্যাপক নীলমণি, দুকড়ি ডাক্তার, নবীন কবিরাজ, অমৃত সরকার, শ্যাম বসু, বিহারী মুখোপাধ্যায়, ভবনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে। সকলেই ঠাকুরের অন্তলীলার দ্রষ্টা এই শ্যামপুকুরে বাটীতে। আবার এই শ্যামপুকুর বাটীতেই ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ ভক্তদের চিহ্নিত করাও হয়েছিল।

[প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ঠাকুরের অবস্থানকালে শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটের এই বাড়ির পূর্বের নম্বর ছিল '৫৫'; প্রয়াত গোকুলচন্দ্র ভট্টাচার্যের পরিবারের কাছ থেকে স্থানীয় বাসিন্দা কিরণচন্দ্র বসু এই বাড়িটি কিনে পরবর্তীকালে দুটিভাগে বিভক্ত করেন, যথা—'৫৫-এ' এবং '৫৫-বি'; বাড়ির '৫৫-এ' অংশেই ঠাকুর বাস করতেন। বর্তমানে বাড়িটির ভিতরের উঠানের দুটী ভাগের মাঝখানে টিনের একটি উচ্চ প্রাচীর; সামনে '৫৫-এ' অংশে দোতলায় যাবার জন্য ভিতরের উঠান থেকে বামদিকে পৃথক সিঁড়ি তৈরী হয়েছে। এই অংশের দোতলার রাস্তার দিকের পূর্ব-পশ্চিমে প্রশস্ত বৈঠকখানা ঘরে অসুস্থ ঠাকুর বাস করতেন। শ্যামপুকুরের এই বাড়িটি আজ বিভক্ত হলেও, যে ঘরে ঠাকুর থাকতেন সেই ঘরটি বর্তমানে সংস্কার ক'রে সযত্নে রক্ষিত আছে। এই বাড়ি থেকে ঠাকুর কাশীপুরে চ'লে যাবার পর, বহুদিন এই বাড়িতে কেউ বাস করেনি,—প্রকৃতপক্ষে এটিকে লোকে 'ভুতুড়ে বাড়ি' মনে করত। পরে এই বাড়িটি ভাড়া দেওয়া হয়। আগুনকে

যেমন ছাই দিয়ে চেপে রাখা যায় না, এই বাড়ির মহিমাকেও তেমন চেপে রাখা যায় নি। মুষ্টিমেয় কয়েকজন যুবকভক্ত এখানে ১৯৭৮ সালের ২৭শে জুলাই 'শ্যামপুকুর বাটী শ্রীরামকৃষ্ণ সংঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই বাড়িতে ঠাকুরের শেষ স্মৃতি বজায় রাখার ভার গ্রহণ করেন এবং বাড়ির মালিক সন্তোষকুমার বসুর অভিপ্রায়ে এই বাড়ির তত্ত্বাবধানের ভার উক্ত সংঘের ওপর ন্যস্ত হয়। সঙ্ঘ কর্তৃক এই বাড়ির দোতলায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবহৃত ঘরখানির আমূল সংস্কারের পর, ঘরটি আকারে ও আয়তনে কিছুটা পরিবর্তিত হলেও মূল স্থানটি এখনও ঠিকই আছে এবং সেখানে ঠাকুর-মা-স্বামীজীর প্রতিকৃতি, বেদীর ওপর পূজিত হচ্ছে। ঘরের যে স্থানটিতে ঠাকুর 'বরাভয়' মূর্তিতে ভক্তদের কৃপা ক'রেছিলেন, সেই বিশেষ স্থানের দেওয়ালে পৃথকভাবে ঠাকুর ও মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতিকৃতি শোভা পাচ্ছে। ঠাকুরের এই বাড়িতে শেষ অবস্থানের প্রায় ৯৩ বছর বাদে একমাত্র গৃহীভক্তদের দ্বারাই এই বাড়িটি সংস্কার এবং গৃহীভক্তদের দ্বারাই সংরক্ষণ ও পরিচালনা—এ এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা! ঠাকুর-মা-স্বামীজীর জন্মতিথিতে পূজাদি অনুষ্ঠান ছাড়াও, কালীপূজার রাত্রে বিশেষ সমারোহে ঠাকুরের 'বরাভয় লীলা' স্মরণোৎসবও পালিত হয়। বর্তমানে এই বাড়িতে সন্ধ্যায় নিয়মিত পাঠ, ভজন প্রভৃতি হয়।

ভক্তদের জ্ঞাতার্থে শ্যামপুকুর বাটির সংক্ষিপ্ত বর্ণন দেওয়া হ'ল।]

[বাড়ির বর্তমান ঠিকানা:—৫৫-এ, শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪; উত্তর কলকাতার বিধান সরণির ওপর অবস্থিত প্রখ্যাত টাউন স্কুলের পাশ দিয়ে শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটে ঢুকে কয়েক মিনিট হেঁটে গেলেই ডানদিকে রাস্তার ওপরেই প্রাচীন একটি দোতলা বাড়ি, যার দেওয়ালে পাথরের ফলকে লেখা আছে—**Here lived for sametime Sri Sri Ramkrishna Paramhangsa Dev.** আর দোতলার বারান্দায় রাস্তার দিকে শোভা পাছে এক স্মারক প্রতীক—'শ্যামপুকুর বাটী শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ'। বাড়ির গায়ে পশ্চিমদিকে আছে এক প্রাচীন শিব মন্দির, যা ঠাকুরের আমলেও ছিল।]

* * *

'শ্যামপুকুর বাটী' পরিত্যাগ ক'রে ঠাকুরকে কাশীপুর উদ্যানবাটিতে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্ত তাঁর 'পরমহংস দেবের জীবনবৃত্তান্ত' গ্রন্থে উল্লেখ ক'রেছেন:—"ক্রমে ব্যাধি বাড়িয়া উঠিল। অন্নের মণ্ডও গলাধঃকরণ হওয়া দুষ্কর হইতে লাগিল। স্বরভঙ্গের লক্ষণ প্রকাশ পাইল এবং শরীর জীর্ণশীর্ণ হইয়া পড়িল। কোন চিকিৎসাই ফলদায়িনী হইল না। ডাক্তার সরকারের

পরামর্শে কলিকাতার বাহিরে বায়ু-পরিবর্তনের নিমিত্ত চেষ্টা হইতে লাগিল। পরমহংসদেবের শারীরিক অবস্থা অতি ভয়ানক হইয়া পড়িয়াছিল, উঠিয়া এক পদ চলিবার শক্তি ছিল না এবং উঠিলে ক্ষতস্থানে বেদনা উপস্থিত হইত। কিন্তু স্থান-পরিবর্তন করা অনিবার্য হইয়াছিল। বাটীওয়ালারাও সেই সময় বাটী ছাড়িয়া দিবার জন্য বড় বিরক্ত করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু করা যায় কি? কোন্ বাটীতে যাইবেন জিজ্ঞাসা করিলেও তিনি বলিবেন না। তাঁহার অভিমত হইবে, এমন বাটী কোথায়, তাঁহা কেহ জানে না। এইরূপ নানাপ্রকার ভাবিয়া তাঁহার জনৈক সেবক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "প্রভু, কোন্ দিকে বাটী অনুসন্ধান করা যাইবে?' পরমহংসদেব ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, 'আমি কি জানি!' সেবক সে সময়ে কিঞ্চিৎ বিমর্ষ হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, 'প্রভু, আমাদের সহিত এখনও আপনার এই ভাব! বলিয়া দিন কোন দিকে যাইব। অনর্থক ঘুরাইয়া মারিবেন না।' সেবক প্রকাশ্যে বলিলেন, 'কাশীপুর, বরাহনগর অঞ্চলে অন্বেষণ করিব?' তিনি ইঙ্গিতে আজ্ঞা দিলেন। আজ্ঞা পাইবামাত্র সেবক তথায় যাত্রা করিলেন এবং মহিম চক্রবর্তী নামক তাঁহার জনৈক ভক্তের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করায় তিনি একটি সুবৃহৎ উদ্যানের অনুসন্ধান বলিয়া দিলেন। পরে উদ্যান স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ৮০ টাকা মাসিক ভাড়ায় তিন মাসের জন্য ঐ উদ্যানটি আবদ্ধ করা হইল। যে দিবস বাড়ি ভাড়া হইল, সেই দিবসই পরমহংসদেব তথায় গমন করিলেন।"

এই সম্পর্কে 'লীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থের ৫ম খণ্ডে উল্লেখ আছে:—"তখন অগ্রহায়ণের অর্ধেক অতীত হইয়াছে। পৌষ মাসে ঠাকুর বাটী পরিবর্তন করিতে চাহিবেন না জানিয়া ভক্তগণ এখন উঠিয়া পড়িয়া ঐরূপ বাগানবাটীর অনুসন্ধানে লাগিয়া যাইলেন এবং অনতিকালের মধ্যেই কাশীপুরস্থ মতিঝিলের উত্তরাংশ যেখানে বরাহনগর বাজারে যাইবার বড় রাস্তার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, তাহারই সম্মুখে রাস্তার অপর (পূর্ব) পার্শ্বে অবস্থিত ৺রাণী কাত্যায়ণীর জামাতা ৺গোপালচন্দ্র ঘোষের উদ্যানবাটী ৮০ টাকা মাসিক ভাড়ায় ঠাকুরের বাসের জন্য ভাড়া করিয়া লইলেন। ঠাকুরের পরমভক্ত কলিকাতার সিমুলিয়া পল্লীনিবাসী সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় উক্ত বাটী ভাড়ার সমস্ত ব্যয়বহনে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

"বাটী স্থির হইলে শুভদিন দেখিয়া শ্যামপুকুর হইতে দ্রব্যাদি লইয়া যাইয়া উক্ত বাটীতে থাকিবার বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। পরিশেষে অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির একদিবস পূর্বে অপরাহ্নে ভক্তগণ শ্যামপুকুরের বাসা হইতে ঠাকুরকে কাশীপুরের উদ্যান বাটীতে আনয়ন করিলেন এবং ফল পুষ্প সমন্বিত বৃক্ষরাজি

শোভিত ঐ স্থানের মুক্তবায়ু, নির্জনতা প্রভৃতি দর্শনে ঠাকুরকে আনন্দিত দেখিয়া পরম চিত্তপ্রসাদ লাভ করিলেন।"

* * *

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অন্তলীলায় শ্যামপুকুর বাটীতে এসেছিলেন ১৮৮৫ সালের ২রা অক্টোবর ১২৯১ বঙ্গাব্দের ১৮ই আশ্বিন সন্ধ্যায় ; আর এই স্থান ত্যাগ ক'রেছিলেন ১৮৮৫ সালের ১১ই ডিসেম্বর—১২৯১ বঙ্গাব্দের ২৭শে অগ্রহায়ণ অপরাহ্নে। মোট ৭০ দিনের অপূর্বলীলায় শ্যামপুকুর পর্বটিকে প্রেমরসাভিসিক্ত ক'রে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের একান্ত আগ্রহে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে শুভাগমন করেন, যেখানে নূতনভাবে তাঁর দৈবলীলা শুরু এবং প্রকটাবস্থার সব লীলার অবসান !

এবার আমরা ঠাকুরের কাশীপুর পর্বের অন্তলীলায় বিশ্বকল্যাণের জন্য তাঁর নিজ জীবন উৎসর্গ করার বেদনাদায়ক চিত্রটি দর্শন করব।

কাশীপুর পর্ব

১৮৮৫ সালের ২রা অক্টোবর থেকে ১১ই ডিসেম্বর—এই ৭০ দিন অন্তর্লীলার অমূল্য মধ্যপর্ব সংঘটিত হওয়ার পর, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে উত্তর কলকাতার কাশী-পুর উদ্যানবাটীতে স্থানান্তরিত করা হয়, যেখানে তিনি ৮ মাস অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় অবস্থানের পর ১৮৮৬ সালের ১৫ই আগষ্ট মধ্যরাত্রে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। তাই এই কাশীপুর উদ্যানবাটীই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ লীলা-স্থল। জীবের প্রাণশক্তি রক্ষাকল্পে নিজের প্রাণ বলিদান দিলেন ভগবান শ্রীরাম-কৃষ্ণ! যুগধর্মের 'পাঞ্চজন্য' তুমুলরবে দিগন্ত কম্পিতক'রে এখানে অবশেষে স্তব্ধ! জীবজগতের পুঞ্জিত বেদনার হলাহল পান ক'রে হলেন নীলকণ্ঠ! প্রকটলীলার অবসানে শুরু হবে অপ্রকট লীলা,—তাই তারই প্রস্তুতি; এক লীলা ছেড়ে আর এক লীলার সন্ধান, এক বিলাস ছেড়ে আর এক বিলাসের পথে। ভক্তদের কাছে ভগবান অন্তরের অন্তরতম—তাই তাঁর অপ্রকট লীলাতে তাঁর সঙ্গে হয় ভক্তদের মানস-দর্শন, মানস-মহোৎসব। কাশীপুর পর্বটি তাই ভগবানের একাধারে প্রকট ও অপ্রকট লীলার মিলনকেন্দ্র—সসীম ও অসীমের সন্ধিস্থল।

তৎকালীন কাশীপুর উদ্যানবাটী সম্পর্কে 'লীলাপ্রসঙ্গ'-গ্রন্থের ৫ম খণ্ডে উল্লিখিত আছে :—

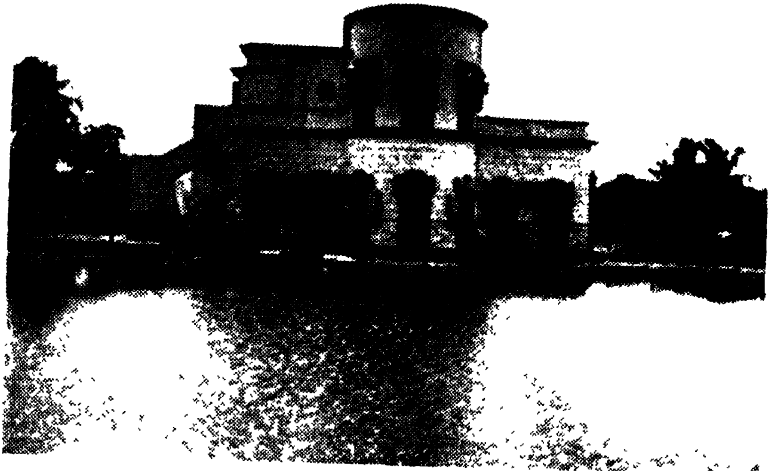
"কলিকাতার উত্তরাংশে যে প্রশস্ত রাস্তাটি প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত বরাহনগরকে বাগবাজার পল্লীর সহিত সংযুক্ত রাখিয়াছে, তাহার উপরেই কাশীপুরের উদ্যানবাটী বিদ্যমান।······রানী কাত্যায়নীর জামাতা ৺গোপালচন্দ্র ঘোষ কাশীপুর উদ্যানবাটীর স্বত্বাধিকারী ছিলেন। ভক্তগণ তাঁহারই নিকট হইতে উহা ঠাকুরের বাসের জন্য মাসিক ৮০টাকা হার নিরূপণ করিয়া প্রথম ছয়মাসের এবং পরে আরও তিনমাসের অঙ্গীকারপত্র প্রদানে ভাড়া লইয়াছিল। ঠাকুরের পরমভক্ত সিমলাপল্লীনিবাসী সুরেন্দ্রনাথ মিত্রই উক্ত অঙ্গীকারপত্রে সহি করিয়া ঐ ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৃহৎ না হইলেও কাশীপুর উদ্যানবাটীটি বেশ রমনীয়। পরিমানে উহা চৌদ্দবিঘা আন্দাজ হইবে।······উহার চতুর্দিক উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত ছিল।"

[প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ঠাকুরের দেহরক্ষার পর ভক্তেরা যখন নানা কারণে

এই উদ্যানবাটী ত্যাগ ক'রে চ'লে যান, তখন থেকে এটি হস্তান্তর হতে থাকে এবং অবশেষে বেলুড়মঠ কর্তৃপক্ষ এটি ক্রয় করেন। প্রথমে উত্তরাংশ ক্রয় করেন ১৯৪৬ সালের ২৪শে মে এবং দক্ষিণাংশ ক্রয় করেন ১৯৪৯ সালের ৬ই জুন। বর্তমানে এটি সম্পূর্ণ বেলুড় মঠের অধীন এবং এখন এটির আয়তন ১১ বিঘা ৪ কাঠা ২ ছটাক ৫০ স্কয়ার ফুট। অধিগ্রহণের পর পুরাতন জীর্ণ বাড়িটির অবলুপ্তি ঘটিয়ে সেই স্থানেই প্রাচীন মূল নক্‌শা অনুযায়ী ঠিক একই ধাঁচে বর্তমানে বাড়িটি নির্মিত হয় এবং ১৯৫৫ সালের ১লা জানুয়ারী এটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠার পর, এই বাড়িটিকেই মন্দিররূপে সযত্নে রক্ষা করা হয়। এখানে ঠাকুরের কোন পৃথক মন্দির নেই, বা মূর্তিও নেই। এই বাড়ির দোতলার যে ঘরে ঠাকুর অবস্থান করেছিলেন এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রেছিলেন সেই ঘরের মেঝের ওপর ঠাকুরের শয্যা প্রস্তুত ক'রে সেখানে তাঁর প্রতিকৃতি বসানো আছে,—যেখানে নিত্যপূজা, আরতি প্রভৃতি হয়। নীচের যে ছোট ঘরটিতে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী অবস্থান করতেন, সেখানেও শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতিতে নিত্য পূজা করা হয়। নীচের বাকি দুটি বড় ঘরের একটিতে ঠাকুরসহ গৃহীভক্তদের ছবি এবং অপরটিতে স্বামীজীসহ কয়েকজন ত্যাগী ভক্তদের ছবি শোভা পাচ্ছে। ঠাকুর-মা-স্বামীজীর জন্মতিথি ছাড়াও প্রতিবছর ১লা জানুয়ারী এখানে সাড়ম্বরে ঠাকুরের 'কল্পতরু' উৎসব প্রতিপালিত হয়।] [এই বাড়ির বর্তমান ঠিকানা :—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, কাশীপুর উদ্যানবাটী, ৯০, কাশীপুর রোড, কলিকাতা—২। উত্তর কলকাতার বাগবাজারের পুলের কাছ থেকে বরানগর অবধি বিস্তৃত কাশীপুর রোডের একাংশের পূর্বদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'হাউসিং এষ্টেট'র সংলগ্ন ঠিক দক্ষিণদিকে এই উদ্যানবাটী,—কাশীপুর রোডের বাস রাস্তার ধারেই। বরানগর বাজার থেকে উত্তর-দক্ষিণে কাশীপুর রোড ধ'রে এলে, পূর্বদিকে এই উদ্যানবাটী পড়ে।]

* * *

কাশীপুরে আসার পরেই ঠাকুর পূর্বাপেক্ষা অনেকটা সুস্থ বোধ করেন এবং যথাসাধ্য তাঁর চিকিৎসারও বন্দোবস্ত হয়। কণ্ঠরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে দক্ষিণেশ্বর, বাগবাজার, শ্যামপুকুর ও কাশীপুরে ভক্তগণ কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে তৎকালীন নামী-অনামী অনেক চিকিৎসককে ঠাকুরের চিকিৎসার্থে নিয়োগ করা হয়; কিন্তু এই কাল ব্যাধির করাল হস্ত থেকে কোন চিকিৎসকই তাঁকে রক্ষা করতে পারেননি। তাঁর অন্তলীলার চারটি পর্বে যে সব চিকিৎসক ঠাকুরের চিকিৎসায় নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাঁরা হলেন—ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, ডাঃ প্রতাপ-



কাশীপুর উদ্যানবাটী

চন্দ্র মজুমদার, ডাঃ বিহারীলাল ভাদুড়ী, ডাঃ রাজেন্দ্রলাল দত্ত, ডাঃ ভগবান রুদ্র, ডাঃ নিতাই চরণ হালদার, ডাঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ইংরাজ প্রিন্সিপাল ডাঃ কোট্‌স্‌, কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন, কবিরাজ নবীন পাল, নবগোপাল কবিরাজ, দ্বারিকানাথ কবিরাজ, গোপীমোহন কবিরাজ, উপেন ডাক্তার, রাখাল ডাক্তার প্রভৃতি। বলা বাহুল্য, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চিকিৎসার জন্য তাঁর সংস্পর্শে এসে এই সব চিকিৎসকগণও ধন্য হয়েছিলেন।

কাশীপুরে ঠাকুরের জন্য ভক্তগণ কর্তৃক সেবাব্রত সম্পর্কে 'লীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থের ৫ম খণ্ডে উল্লেখ আছে :—"ক্রমে সকল বিষয়ের সুবন্দোবস্ত হইতে লাগিল এবং যুবক ভক্তেরা সকলেই এখানে একে একে উপস্থিত হইল। ঠাকুরের সেবাকাল ভিন্ন অন্যসময়ে নরেন্দ্র তাহাদিগকে ধ্যান, ভজন, পাঠ, সদালাপ, শাস্ত্রচর্চা ইত্যাদিতে এমনভাবে নিযুক্ত রাখিতে লাগিলেন যে, পরম আনন্দে কোথা দিয়া দিনের-পর-দিন যাইতে লাগিল, তাহা তাঁহাদিগের বোধগম্য হইতে লাগিল না। একদিকে ঠাকুরের শুদ্ধ নিঃস্বার্থ ভালবাসার প্রবল আকর্ষণ, অন্যদিকে নরেন্দ্রনাথের অপূর্ব সখ্যভাব ও উন্নত সঙ্গ একত্র মিলিত হইয়া তাহাদিগকে ললিত-কর্কশ এমন এক মধুর বন্ধনে আবদ্ধ করিল যে, এক পরিবার-মধ্যগত ব্যক্তিসকল অপেক্ষাও তাহারা পরস্পরকে আপনার বলিয়া সত্য সত্য জ্ঞান করিতে লাগিল, সুতরাং নিতান্ত আবশ্যকে কেহ কোনদিন বাটীতে ফিরিলেও ঐ দিন সন্ধ্যায়, অথবা পরদিন প্রাতে তাহার এখানে আসা এককালে অনিবার্য হইয়া উঠিল। ঐরূপে শেষ পর্যন্ত এখানে থাকিয়া তাহারা সংসার ত্যাগে 'সেবাব্রতের উদ্‌যাপন' করিয়াছিল। সংখ্যায় তাহারা দ্বাদশজনের অধিক না হইলেও প্রত্যেকে গুরুগত-প্রাণ ও অসামান্য কর্মকুশল ছিল। [পাঠকের কৌতূহল নিবারণের জন্য ঐ দ্বাদশ জনের নাম এখানে দেওয়া গেল। যথা—নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম, নিরঞ্জন, যোগীন্দ্র লাটু, তারক, গোপাল দাদা (যুবক ভক্তদিগের মধ্যে ইনিই একমাত্র বৃদ্ধ ছিলেন) কালী, শশী, শরৎ এবং (হুট্‌কো) গোপাল। সারদা পিতার নির্যাতনে মধ্যে মধ্যে আসিয়া দুই-একদিন মাত্র থাকিতে সমর্থ হইত। হরিশের কয়েকদিন আসিবার পরে গৃহে ফিরিয়া মস্তিকের বিকার জন্মে। হরি, তুলসী ও গঙ্গাধর বাটীতে থাকিয়া তপস্যা ও মধ্যে মধ্যে আসা-যাওয়া করিত, তদ্ভিন্ন অন্য দুইজন অল্পদিন পরে মহিমাচরণ চক্রবর্তীর সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার বাটীতেই থাকিয়া গিয়াছিল।]"

উক্ত 'লীলাপ্রসঙ্গ'-গ্রন্থে কাশীপুরে যে সব ভক্তদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের পরিচিতি এইরূপ :—নরেন্দ্র—স্বামী বিবেকানন্দ; রাখাল—স্বামী

ব্রহ্মানন্দ ; বাবুরাম—স্বামী প্রেমানন্দ ; নিরঞ্জন—স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ; যোগীন্দ্র—স্বামী যোগানন্দ ; লাটু—স্বামী অদ্ভুতানন্দ ; তারক—স্বামী শিবানন্দ ; গোপাল দাদা—স্বামী অদ্বৈতানন্দ ; কালী—স্বামী অভেদানন্দ ; শশী—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ; শরৎ—স্বামী সারদানন্দ ; হুট্‌কো গোপাল—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত তরুণ ভক্ত ও বিশিষ্ট সেবক গোপালচন্দ্র ঘোষ (ইনি ছোট গোপাল নামেও পরিচিত) ; সারদা—স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ ; হরিশ—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্যভক্ত হরিশ কুণ্ডু ; হরি—স্বামী তুরীয়ানন্দ ; তুলসী—স্বামী নির্মলানন্দ ; গঙ্গাধর—স্বামী অখণ্ডানন্দ ; মহিমাচরণ চক্রবর্তী—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাশীপুর নিবাসী ভক্ত (উদ্যানবাটীর কাছেই নিজ বাড়িতে বাস করতেন)। কেবলমাত্র ঠাকুরের আরও দুই ত্যাগী সন্তান—স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ও স্বামী সুবোধানন্দ সেই সময় কার্যগতিকে সেখানে সেবাব্রতে যোগদান করতে পারেননি। এছাড়া শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী ও দু'একজন মহিলা ভক্তও উদ্যানবাটীতে ঠাকুরের সকল প্রকার পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করেছিলেন। কাশীপুরে ভক্তগণ যেমন একদিকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রাণপণ সেবা করতেন, তেমন অপরদিকে সাধন-ভজন, বেদ-বেদান্ত ও শাস্ত্রাদির আলোচনা, বিজ্ঞান-দর্শন-ইতিহাস গবেষণা প্রভৃতি বিষয়ে প্রধান অংশ গ্রহণ করেন। ঠাকুরও এই সময় রোগ যন্ত্রণার কোন প্রকার লক্ষণ প্রকাশ না ক'রে, সদানন্দভাবে ভক্তদের সঙ্গে মিশতেন এবং সকলকে সাধনপথে দ্রুত অগ্রসর হতে সাহায্য করতেন। এই সেবাব্রত সম্পর্কে স্বামী অভেদানন্দ তাঁর 'আমার জীবন কথা' গ্রন্থে উল্লেখ ক'রেছেন—"২০শে অগ্রহায়ণ (ইং ১১ই ডিসেম্বর ১৮৮৫) শুভদিনে শ্রীশ্রীঠাকুরকে শ্যামপুকুর হইতে কাশীপুরে আনয়ন করা হইল। সেবকরূপে আমরা এবং শ্রীশ্রীমা ও গোলাপ-মা তাঁর সঙ্গে কাশীপুরের বাগানবাটীতে উপস্থিত হইলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে ও উপস্থিত সকল সন্তানকে একদিন বলিলেন, 'ছাখ্, আমার এই গলার ঘা একটি উপলক্ষ্য মাত্র। এই কারণে তোরা সকলে একত্র হয়েছিস।'

"প্রথম প্রথম আমরা দুই-তিনজন শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা-শুশ্রূষা করিতাম। শ্রীমা শ্রীশ্রীঠাকুরের পথ্যরন্ধন করিতেন। গোলাপ-মা ও লক্ষ্মীদিদি শ্রীমাকে সাহায্য করিতেন। ক্রমে সেবকগণের সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখন একটি পাচক ব্রাহ্মণ ও একজন দাসীও নিযুক্ত করা হইয়াছিল।"

এই ভাবে ঠাকুরের সেবা উপলক্ষে তাঁর ভক্তগণ এখানে সমবেতভাবে মধুর বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ভাবী সেবাব্রতের বিরাট দায়িত্বের অধিকারী হয়েছিলেন। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, ঠাকুর স্বামী অভেদানন্দের কাছে প্রকাশ করেই

ফেলেছিলেন যে, রোগটি ছিল তাঁর উপলক্ষ্য এবং সকলকে সেবাব্রতের একসূত্রে বন্ধন করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। ঠাকুরের গৃহীভক্তেরাও এই সময় তাঁদের সাধ্যমত ঠাকুরের সেবার জন্য সমুদয় অর্থ ব্যয় এবং অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয়ের ভার নেওয়ায় তাঁরাও ঠাকুরের এই কাশীপুর লীলার সঙ্গীরূপে নিজেদের জন্ম সার্থক করেছিলেন।

*　　　*　　　*

কাশীপুরে ঠাকুরের ৮মাস অবস্থানের সময়, এত বিভিন্ন ঘটনা ঘটে, যার সবগুলির উল্লেখ করা কঠিন। 'ঘটনা' মানেই 'লীলা'; এই লীলার সঠিক মূল্যায়ন করা, বা লীলাকে উপলব্ধি করা সাধারণ জীবের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা যেটিকে একটি ক্ষুদ্র ঘটনা বলে অনুমান করেছি, অবতারলীলায় তার তাৎপর্য হয়তো অনেক বেশী। সুতরাং সে সকলের বিচার কে করবে? কাশীপুরেই ঘটেছিল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সৎ-চিতের মূর্তপ্রকাশ! এখানেই তাঁর আকুলপ্রাণের করুণ সুর অমৃতধারা বহন ক'রে প্লাবিত করেছিল জাগতিক অন্তর। পূর্ণব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ জীবের বন্ধন মুক্ত ক'রে, অখণ্ড ব্রহ্মানন্দের প্লাবনে ধরাকে স্বর্গে পরিণত ক'রে, প্রকৃতপক্ষে অনাবিল আনন্দের তুফানে তিনি নিজেই নিমজ্জিত ছিলেন। তাই মরজগতে মনুষ্যদেহ ধারণ ক'রে সারাটি জীবন তিনি বিভিন্ন সময়ে যে বহু বিচিত্র লীলা ক'রে গেছেন, তারই অন্তভাগ এই কাশীপুর পর্বে; অন্তরঙ্গ ছাড়া তাই অন্তলীলা কে বুঝবে? সুতরাং, কেবলমাত্র কয়েকটি তথ্য এবং সম্ভবস্থলে কয়েকটি সহজ তত্ত্ব অনুসন্ধানের মাধ্যমেই এই কাশীপুর পর্ব সীমাবদ্ধ রাখব—যা আমাদের কাছে চির মহিমান্বিত সম্পদ।

*　　　*　　　*

কাশীপুর পর্বে প্রথমেই দুটী ঘটনার উল্লেখ করব—যে গুলির সঙ্গে ঠাকুরের নরলীলায় তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ প্রত্যক্ষভাবে ও একান্তভাবে জড়িত। প্রথমটি ঠাকুর কর্তৃক তাঁর ত্যাগী সন্তানদের গৈরিকবস্ত্রদান ও সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষা—আর দ্বিতীয়টি ঠাকুরের নির্দেশে ত্যাগী সন্তানগণ কর্তৃক ভিক্ষাব্রত উদ্‌যাপন। এই দুটি ঘটনার মাধ্যমে অবতারজীবনের দেবত্ব ও মানবত্বের সংমিশ্রণের পরিচয় পাওয়া যায়।

অগ্রহায়ণ মাস শেষ হওয়ার একদিন পূর্বে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে ঠাকুরের আগমনের পর পৌষ-সংক্রান্তি উপলক্ষে ত্যাগী সন্তানদের গৈরিক বস্ত্র ও রুদ্রাক্ষের মালা দান ও সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষাদান অবশ্যই শ্রীরামকৃষ্ণজগতে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা!

ঠাকুরের ভক্ত বুড়োগোপাল, তথা শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ (পরবর্তী কালে স্বামী

অদ্বৈতানন্দ) তীর্থযাত্রা সঙ্গে ক'রে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে সকলের সঙ্গে মিলিত হন এবং গঙ্গাসাগরের মেলা উপলক্ষে জগন্নাথ ঘাটে আগত সন্ন্যাসীদের মধ্যে দ্বাদশ জনকে দ্বাদশ খানি গৈরিকবস্ত্র ও রুদ্রাক্ষের মালা দেওয়ার সঙ্কল্প করেন। ঠাকুরকে এই কথা জানালে তিনি বুড়ো গোপালকে বলেন যে তাঁর ত্যাগী সন্তান-দের এই বস্ত্র দান করলে হাজার গুণ বেশী ফল হবে; কারণ তাঁরা প্রত্যেকে হাজার সাধুর সমান। অতঃপর বুড়োগোপাল ঠাকুরের হাতে গৈরিকবস্ত্র ও রুদ্রাক্ষের মালা তুলে দিলে, ঠাকুর তাঁর উপস্থিত এগারোজন সন্তানকে একখানি ক'রে গৈরিক বস্ত্র ও রুদ্রাক্ষের মালা দান ক'রে তাঁদের অন্তর্সন্ন্যাস অভিষিক্ত করেন এবং উদ্বৃত্ত গৈরিকবস্ত্রটি ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্রের জন্য তুলে রাখেন; পরে গিরিশচন্দ্র তা গ্রহণ করেছিলেন।

সেদিন বিরজাহোম দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে ত্যাগী সন্তানদের ঠাকুর সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা না দিলেও, অবতার পুরুষ কর্তৃক এই দৈবক্রিয়া বাহ্যিক অনুষ্ঠান অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল; অবশ্য স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন যে, ঠাকুর সেদিন এইভাবেই তাঁদের সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষিত ক'রেছিলেন। তাঁর 'আমার জীবন কথা' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ ক'রেছেন—"আমরা গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করিতে গেলাম। তিনি আমাদিগকে সন্ন্যাসীর বেশে দেখিয়া অতিশয় আনন্দ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি আমাদিগকে সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। সেইদিন হইতে আমরা সাদা কাপড় ত্যাগ করিয়া গৈরিক বস্ত্রই পরিধান করিতে লাগিলাম। এগারো জন সেবক যাহারা গেরুয়া পাইয়াছিল, তাহাদের নাম—নরেন, রাখাল, নিরঞ্জন, বাবুরাম, শশী, শরৎ, কালী, যোগীন, লাটু, তারক ও বুড়োগোপাল। শ্রীশ্রীঠাকুর গিরিশ ঘোষের জন্য অবশিষ্ট একখানি গৈরিক বস্ত্র রাখিয়া দিতে বলিলেন। পরে গিরিশবাবু উহা পাইয়া মস্তকে ধারণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন।"

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ঠাকুরের ত্যাগী সন্তান ছিলেন মোট ১৬ জন, এই ১৬ জনের মধ্যে সেদিন ঠাকুরের কাছে উপস্থিত ছিলেন মোট ১১ জন। পরবর্তীকালে ঠাকুরের মহাপ্রয়াণের পর ১৬ জন ত্যাগী সন্তানই বিরজাহোম দ্বারা বিভিন্ন সময়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শাস্ত্রমতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এই সম্পর্কে স্বামী অভেদানন্দ তার 'আমার জীবন কথা'-গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন :—"একদিন নরেন্দ্রনাথ আমাদের সকলকে বলিল, 'আমরা শাস্ত্রবিধান-অনুসারে যদি এবার সন্ন্যাস লই, তাতে তোমাদের অভিমত কি ?' আমি বলিলাম, 'হ্যাঁ, শাস্ত্রমতে সন্ন্যাস নিতে গেলে আমাদের সকলকে বিরজাহোম করতে হবে। বিরজাহোমের মন্ত্র আমার কাছে

আছে।' নরেন্দ্রনাথ শুনিয়া একান্ত আগ্রহের সহিত বলিল, 'তুমি বিরজাহোমের মন্ত্র কিভাবে পেলে?' আমি তখন বরাবর পাহাড়ে যাইবার সময়ে যেইভাবে একজন দশনামী সন্ন্যাসীর নিকট হইতে বিরজাহোমের মঠ, মড়ি, প্রেষমন্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া একটি খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা আনুপূর্বিক বলিলাম। নরেন্দ্রনাথ শুনিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিল, 'সমস্তই শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা ও কৃপা! তাহ'লে এসো একদিন পূজা হোমাদি ক'রে বিরজাহোমের অনুষ্ঠান করি ও শাস্ত্রীয় মতে সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষিত হই।'

"আমরা সকলেই আনন্দে সম্মত হইলাম। দিনও স্থির হইল। যতদূর মনে আছে, ১২৯৩ সালের মাঘ মাসের গোড়ার দিকে একদিন প্রাতঃকালে সকলে গঙ্গায় স্নান করিয়া বরাহনগর মঠে ঠাকুর ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র পাদুকার সম্মুখে উপবেশন করিলাম। শশী (রামকৃষ্ণানন্দ) বিধিমত শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা সমাপ্ত করিল। হোমের জন্য কিছু বিল্বকাষ্ঠ, বারোটি বিল্বদণ্ড ও গব্যঘৃত সংগ্রহ করা হইয়াছিল। অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হইল। নরেন্দ্রনাথের আদেশে আমি তন্ত্রধারক-রূপে আমার খাতা হইতে সন্ন্যাসের প্রেষমন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলাম। প্রথমে নরেন্দ্রনাথ ও পরে রাখাল, নিরঞ্জন, শরৎ, শশী, সারদা, লাটু প্রভৃতি সকলে আমার পাঠের সঙ্গে সঙ্গে প্রেষমন্ত্র পড়িতে পড়িতে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে আহুতি দান করিল। পরে আমি প্রেষমন্ত্র পড়িয়া অগ্নিতে আহুতি দিলাম। অবশ্য সন্ন্যাসদীক্ষা আমরা পূর্বেই শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকটে পাইয়াছিলাম।···তবে শাস্ত্রবিধি-অনুসারে সন্ন্যাসানুষ্ঠান আমাদের বরাহনগর মঠেই হইয়াছিল।"

সুতরাং ঠাকুর কর্তৃক তাঁরা সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষিত হলেও, পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে শাস্ত্রসম্মত সন্ন্যাস গ্রহণের দ্বারা, তাঁরা শাস্ত্রধর্ম রক্ষা ক'রেছিলেন। সন্ন্যাস-গ্রহণের পর ঠাকুরের ১৬ জন ত্যাগী সন্তান নিম্নলিখিত নামে পরিচিত হন; যথা—

স্বামী বিবেকানন্দ (নরেন্দ্রনাথ দত্ত)
স্বামী ব্রহ্মানন্দ (রাখালচন্দ্র ঘোষ)
স্বামী শিবানন্দ (তারকনাথ ঘোষাল)
স্বামী অখণ্ডানন্দ (গদাধর গঙ্গোপাধ্যায়)
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ (হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়)
স্বামী অভেদানন্দ (কালীপ্রসাদ চন্দ্র)
স্বামী সারদানন্দ (শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী)
স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ (শশীভূষণ চক্রবর্তী)
স্বামী যোগানন্দ (যোগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী)

স্বামী নিরঞ্জনানন্দ (নিত্যনিরঞ্জন ঘোষ)
স্বামী প্রেমানন্দ (বাবুরাম ঘোষ)
স্বামী অদ্ভুতানন্দ (লাটু)
স্বামী অদ্বৈতানন্দ (গোপালচন্দ্র ঘোষ)
স্বামী তুরীয়ানন্দ (হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়)
স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ (সারদা প্রসন্ন মিত্র)
স্বামী সুবোধানন্দ (সুবোধচন্দ্র ঘোষ)

* * *

ঠাকুর কর্তৃক ত্যাগী সন্তানদের ভিক্ষা করার আদেশ কাশীপুর পর্বে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গৃহীভক্তেরা কাশীপুরে খরচ কমাবার জন্য আলোচনা করায়, ঠাকুর অভিমানবশতঃ তাঁর ত্যাগী সন্তানদের আদেশ করেন যে, তাঁরা যেন ভিক্ষা ক'রে ঠাকুরের খাওয়ার ব্যবস্থা করেন।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, প্রকৃতপক্ষে গৃহীভক্তেরা ঠাকুরের সেবার জন্য অর্থব্যয়ে বিশেষ কার্পণ্য না করলেও, ঠাকুরের সেবার কাজে নিযুক্ত সেবকের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকায় তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সত্যই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। এই ঘটনাটিকে উপলক্ষ্য ক'রেই ঠাকুর তাঁর ত্যাগী সন্তানদের ভিক্ষায় উৎসাহ দেন এবং প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাসধর্মের মাধুকরীব্রত তাঁদের দ্বারায় উদ্‌যাপন করিয়ে ঠাকুর শাস্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করেন। ঠাকুরের তৎকালীন ত্যাগী সন্তানদের ভিক্ষাগ্রহণের ঘটনা এবং তৎসহ তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা এখানে প্রকাশ করা আবশ্যক। এই বিষয়ে স্বামী অভেদানন্দ তাঁর 'আমার জীবনকথা' গ্রন্থে যে অপূর্ব বর্ণনা ক'রেছেন তারই একটি অংশ :—

"পরদিন প্রাতে নরেন্দ্রনাথ, নিরঞ্জন, হুটকো-গোপাল ও আমি প্রথমেই নীচে শ্রীমার নিকট ভিক্ষা করিতে যাইয়া বলিলাম,

অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্কর প্রাণবল্লভে।
জ্ঞান-বিজ্ঞান-সিদ্ধার্থং ভিক্ষাং দেহি মে পার্বতি ॥

করুণাময়ী শ্রীমা অবাক্ হইয়া আমাদের সকলকে মুষ্টিভিক্ষা দিলেন। তখন শ্রীমার পদধূলি লইয়া আমরা ভিক্ষা করিবার জন্য পথে বাহির হইলাম। ইহার পূর্বে আমরা আর কখনও ভিক্ষা করি নাই এবং কিরূপে বাহিরে যাইয়া ভিক্ষা করিতে হয়, তাহাও জানিতাম না। নিরঞ্জন মাথায় গেরুয়া পাগড়ি বাঁধিয়া হিন্দুস্থানী সাধু সাজিয়া 'মায়ি, থোড়া ভিক্ষা দিজিয়ে' বলিয়া ভিক্ষা আরম্ভ করিল।

আমরা বাংলাতেই 'ভিক্ষা দাও' বলিয়া ভিক্ষা আরম্ভ করিলাম। কোন কোন বাড়ির মেয়েরা চাল, আলু, কাঁচকলা, বেগুন ইত্যাদি ভিক্ষা দিল। কেহবা নানা কথা শুনাইয়া দিল। কেহ বলিল, 'হোঁৎকা মিন্সে, চাক্‌রী কর্‌তে পারিস্‌নি, আবার ভিখারী সেজে ভিক্ষা করতে বার হয়েছিস্‌?' কেহ বলিল, ইহারা ডাকাতের দল, সন্ধান লইতে আসিয়াছে। অপর কেহ গুণ্ডার দলের লোক বলিয়া আমাদের তাড়া করিল। আমরা নীরবে সকল রকম ভর্ৎসনা অকাতরে সহ্য করিয়া এক বাড়ি হইতে অপর বাড়ির দ্বারে উপস্থিত হইলাম। অবশেষে যাহা ভিক্ষায় পাইলাম, তাহা লইয়া আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের পদতলে সমর্পণ করিলাম। তাহা দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি ঐ ভিক্ষা শ্রীমাকে রন্ধন করিবার জন্য আদেশ করিলেন। শ্রীমা সেই ভিক্ষান্নের তরল-মণ্ড রন্ধন করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহা মুখে দিয়া বলিলেন, 'ভিক্ষান্ন অতি পবিত্র। এতে কারু কোন কামনা নেই। আজ ভিক্ষান্ন খেয়ে আমি পরমানন্দ লাভ করলাম'। তাহার পর আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ পাইয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলাম। তাহার পর যোগীন, শরৎ, শশী, রাখাল প্রভৃতি সকলেই এক-একদিন ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিল।"

ঘটনাটি যদিও সাময়িক, কিন্তু এইভাবে ঠাকুর তাঁর অন্তলীলায় যেমন শাস্ত্রের মর্যাদা রক্ষার্থে সন্ন্যাসীদের ভিক্ষাব্রতে উৎসাহী করেছিলেন, তেমনি গৃহীভক্তদেরও তাঁর সেবা কাজ থেকে বিচ্যুত না হ'তে প্রকারান্তরে তাঁদেরই কৃপা ক'রে সাহায্য ক'রেছিলেন, যাতে তাঁরা অজ্ঞানতাবশতঃ সেবাপরাধের দায় থেকে অব্যাহতি লাভ করেন। এ-ও ঠাকুরের পরম করুণা! কারণ, এরপর থেকে গৃহীভক্তগণ ঠাকুরের সকল প্রকার সেবাকাজে আরও সতর্ক হন।

* * *

এমন ঘটনার পর ঘটনায় কাশীপুর পর্ব ভরপুর এবং সবগুলিই অর্থবহ। আরো কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ এরূপ কাহিনী এখানে নিবেদিত হ'ল। প্রতিটি ঘটনাই ঠাকুরের অন্তলীলার এক-একটি দিক্।

একটি ঘটনা। কাশীপুর উদ্যানবাটীতে একটি খেজুর গাছে হাঁড়ী লাগিয়ে জনৈক মালী সেই গাছ থেকে প্রতিদিন প্রত্যূষে খেজুর-রস সংগ্রহ করত। সেবক নিরঞ্জনের মাথায় এক মতলব আসে যে তিনি ঐ গাছের জীরেন রস চুরি ক'রে খাবেন; অন্যান্য ভক্তেরাও এই প্রস্তাবে রাজী হন। একদিন গভীর রাত্রে নিরঞ্জন, হুট্‌কো-গোপাল প্রভৃতি উদ্যানের ভিতরে প্রবেশ ক'রে সেই খেজুর গাছটির অনুসন্ধান করতে থাকেন—কিন্তু কোনমতেই সেই পূর্বপরিচিত গাছটির

সন্ধান করতে না পেরে তাঁরা ফিরে আসেন এবং বুঝতে পারেন যে, এটা ঠাকুরেরই এক অদ্ভুত খেলা। এদিকে শ্রীশ্রীমা বাড়ির জানালা দিয়ে সেই রাত্রে সেই সময়েই উদ্যানের মধ্যে ঠাকুরকে নিরঞ্জনাদি ভক্ত সঙ্গে ভ্রমণ করতে দেখেন, যদিও ঠাকুর তখন অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় নিজের শয্যাতেই শয়ন করেছিলেন এবং দুজন সেবক তাঁর সেবায় নিযুক্ত ছিলেন।

* * *

আর একটি ঘটনা। ঘটনাটি কাশীপুর পর্বে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি-সংক্রান্ত। 'একদা কাশীপুরে অসুস্থ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে গিয়ে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি বিহ্বল হয়ে পড়েন এবং ঠাকুরকে বলেন যে, তাঁর মত পরম শক্তিমান পুরুষ ইচ্ছা করলেই নিজের মন একাগ্র ক'রে একবার অসুস্থস্থানে কিছুক্ষণ ধারণ করলেই, সব রোগ সেরে যেতে পারে। ঠাকুর তার উত্তরে ব'লেছিলেন—'তুমি পণ্ডিত হয়ে একথা কি ক'রে ব'ল্লে গো? যে মন সচ্চিদানন্দকে দিয়েছি, তাকে সেখান থেকে তুলে এনে এই ভাঙা হাড়-মাংসের খাঁচাটার ওপর দিতে আর প্রবৃত্তি হয়?' তর্কচূড়ামণিও ছাড়বার পাত্র নন; তিনি ঠাকুরকে বলেন—'তবে মা'র (জগন্মাতার) সঙ্গে যখন কথা কইবেন, তখন তাঁকে আপনার গলার ঘায়ের যাতে উপশম হয়, সে কথা বলবেন'। এই কথায় ঠাকুর উত্তর দিয়েছিলেন—'আমি যখন জগতের মাকে দর্শন করি, তখন আমার শরীর ও জগৎ সবই ভুল হয়ে যায়। সুতরাং তুচ্ছ হাড়-মাংসের শরীরের কথা আর মাকে কেমন ক'রে বলি!' এই উত্তরে তর্কচূড়ামণি বিস্মিত হন।

এখানে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির কিছু পরিচয় দেওয়া অবশ্যক। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত শশধর ছিলেন পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার মুখডোবা গ্রাম-নিবাসী প্রখ্যাত দার্শনিক ও বক্তা। জন্ম ১৮৫০ সালে। হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার জন্য তিনি নানাস্থানে সভা-সমিতি মারফৎ বক্তৃতা করতেন এবং সেসব স্থানে তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য প্রচুর ভীড় হ'ত। কলকাতার 'এ্যালবার্ট হলে' তাঁর বক্তৃতার ব্যবস্থা হওয়ায়, তৎকালীন যুব ও ছাত্রসমাজ সেই বক্তৃতা শুনতে সেখানে যোগদান করতেন এবং তাঁদের মধ্যে ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের কয়েকজনও উপস্থিত থাকতেন। আধ্যাত্মিক জগতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকারী শশধরের নাম ও পরিচয় শুনে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ন্যায় পণ্ডিতের সঙ্গে পরিচয় করার জন্য ভক্তদের কাছে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায়, স্বামীজীই প্রথম ঠাকুরকে শশধরের কাছে নিয়ে যান এবং ঠাকুরের মুখে জলন্ত শক্তিপূর্ণ নানা মহাবাক্য শ্রবণ ক'রে শশধর ঠাকুরের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। পরে শশধর

নিজেই দক্ষিণেশ্বরে ও বাগবাজারে ভক্ত বলরাম বসুর বাড়িতে কয়েকবার ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হয়ে ঠাকুরের কাছে ভক্তি প্রার্থনা করায়, ঠাকুর ভাবাবিষ্ট অবস্থায় শশধরের বক্ষস্পর্শদ্বারা তাঁকে কৃপা করেছিলেন এবং শশধরও ঠাকুরের শ্রীচরণ নিজ বক্ষে ধারণ ক'রে অশ্রুবিসর্জন করেছিলেন। পরবর্তীকালে, ভক্ত শশধর প্রচার-কার্য পরিত্যাগ করে কাশীমবাজারের জমিদার রায়বাহাদুর অন্নদাপ্রসাদ রায়ের সভাপণ্ডিত নিযুক্ত হয়েছিলেন ; শেষ বয়সে তিনি বহরমপুরের জুবিলী টোলের অধ্যক্ষ হন এবং মুর্শিদাবাদের খাগড়ায় বাড়ি ক'রে স্থায়ীভাবে বাস করেন। ১৯২৮ সালে শশধরের দেহত্যাগ হয়।

*　　*　　*

অনুরূপ একটি ঘটনা। ঘটনাটি কাশীপুর পর্বে ঠাকুরের পরমভক্ত দুর্গাচরণ নাগ সংক্রান্ত। একদা কাশীপুরে অসুস্থ ঠাকুরকে দেখতে গিয়ে, দুর্গাচরণের কাছে ঠাকুরের রোগযন্ত্রণা দুর্বিসহ বোধ হয়। তিনি প্রয়োজন বোধে ইতিপূর্বে যোগবলে অনেক অসাধ্য সাধন ক'রেছিলেন এবং কয়েকবার সমাধিমগ্নও হয়েছিলেন। তাই ঠাকুরকে সুস্থ করার জন্য দুর্গাচরণ সেদিন যোগবলে নিজের শরীরে ঠাকুরের রোগ ধারণ করার জন্য উদ্যত হ'লে, ঠাকুর তাঁকে সেই কাজ থেকে নিবৃত্ত করেন। অবশ্য ঠাকুর নিজেই একদিন অসুস্থ অবস্থায় তাঁর নিজ শরীরের গাত্রদাহ কমাবার উদ্দেশ্যে দুর্গাচরণের শীতলদেহ স্পর্শের জন্য তাঁকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ ব'সেছিলেন।

এই পরমভক্ত দুর্গাচরণ নাগের কিছু পরিচয় দেওয়া এখানে আবশ্যক। ঠাকুরের বিশেষ কৃপা প্রাপ্ত গৃহীশিষ্য দুর্গাচরণের জন্ম ১৮৪৬ সালে পূর্ববঙ্গের ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ শহরের কাছে 'দেওভোগ' নামক গ্রামে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর কাছে তিনি 'নাগ মশাই' নামে পরিচিত ছিলেন।

নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা শহরে লেখাপড়া শেষ ক'রে প্রথম জীবনে তিনি পিতার কর্মস্থল কলকাতায় এসে তদানীন্তন 'ক্যামবেল ও মেডিক্যাল স্কুলে (বর্তমানে নীল-রতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ) ডাক্তারী পড়া শুরু করেলও, সেই পড়া অসমাপ্ত রেখে তিনি জনৈক হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের কাছে হোমিওপ্যাথী শিক্ষা ক'রে, হোমিওপ্যাথ ডাক্তাররূপে চিকিৎসা জগতে প্রতিষ্ঠিত হন এবং বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা করা শুরু করেন ; পরে অবশ্য কলকাতায় পিতার কর্মস্থলে যোগদান ক'রে কলকাতায় বসবাস শুরু করেন। পূর্ববঙ্গে অবস্থানকালেই তাঁর বিবাহ হলেও পত্নীর কাছ থেকে তিনি সর্বদাই দূরে থাকতেন ; প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর পিতার চাপে তিনি পুনরায় পূর্ববঙ্গে গিয়ে দ্বিতীয়বার বিবাহ করলেও জীবনে কোন দিন

স্ত্রী-সঙ্গ করেন নি ; বরং স্ত্রীকে আধ্যাত্মিক জীবন অনুসরণে নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রথম অবস্থায় কুলগুরুর কাছে সস্ত্রীক দীক্ষা নেওয়ার পর, তিনি স্ত্রীকে গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

একদা সাধুদর্শন উপলক্ষে দুর্গাচরণ প্রথম দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করতে গেলে, ঠাকুরের নির্দেশে তিনি সেখানে পঞ্চবটীতে ধ্যান করেন এবং দু'একবার সেখানে যাতায়াতের পরই একদিন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ অবস্থায় তাঁর বক্ষে চরণ অর্পণ ক'রে তাঁকে বিশেষ কৃপা করেন। এরপর থেকেই দুর্গাচরণের জীবনে পরিবর্তন আসে এবং তিনি হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা ও পিতার কাজও ত্যাগ ক'রে, অন্তরে বৈরাগ্যের স্পৃহা নিয়ে ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হন ; কিন্তু ঠাকুর তাঁকে গৃহস্থাশ্রমে থেকেই গৃহীদের ধর্ম শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করার নির্দেশ দিলে, তিনি আজীবন তা পালন করেন। অহিংসা ও করুণার প্রতীক হিসাবে তিনি 'গার্হস্থ-সন্ন্যাস' গ্রহণ ক'রে সংসারে বাস করায়, তাঁকে 'সাধু নাগ মশাই' বলা হ'ত। তপস্যার জন্য সর্বপ্রকার উগ্র কৃচ্ছ্রসাধন ক'রে, তিনি গৃহস্থজীবনের উদাহরণ স্বরূপ সন্ন্যাসীর ন্যায় বিরাজ করতেন এবং যোগবলে নানা অসাধ্য-সাধন করতেন। ঠাকুরের পরমভক্ত দুর্গাচরণ ঠাকুরের দেহরক্ষা হ'লে নিদারুণ শোকে আহার-নিদ্রা এমনকি শৌচাদিও পরিত্যাগ ক'রে শয্যাগ্রহণ করায়, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানগণের একান্ত চেষ্টায় তাঁকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর প্রতিও তাঁর অসীমভক্তি ছিল। ১৮৯৯ সালে দুর্গাচরণ তাঁর স্বগ্রাম দেওভোগে দেহত্যাগ করেন।

* * *

আর একটি ঘটনা। একদা কাশীপুরে ঠাকুরের অপেক্ষাকৃত সুস্থ অবস্থায় ভক্তপ্রবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি ঠাকুরকে দর্শন করতে যান ; সেই সময় জনৈক ভক্ত ঠাকুরের জন্য ফুলের মালা আনায়, নিজের গলা থেকে দু'গাছি মালা নিয়ে ঠাকুর গিরিশকে দেন। অতঃপর বরানগর বাজারে ফাগুর খাবারের দোকান থেকে গিরিশের জন্য গরম কচুরী, লুচি ও অন্যান্য মিষ্টান্নাদি আনিয়ে নিজে হাতে ক'রে গিরিশের হাতে খাবার তুলে দেন। গিরিশ যখন আহারে নিযুক্ত, ঠাকুর তখন গিরিশের খাওয়ার জলের যোগাড়ে ব্যস্ত। ঠাকুরের শয্যার দক্ষিণপূর্ব কোনে কুঁজায় জল ছিল। কিন্তু অসুস্থ ঠাকুরের দাঁড়াবারও শক্তি নেই ; তবুও বালকের মত শয্যা থেকে এগিয়ে গিয়ে নিজে সেই কুঁজা থেকে জল গড়িয়ে আবার সেই ভাবেই ফিরে এসে গিরিশকে সেই জল দিলেন। উপস্থিত ভক্তেরা করুণাময় ঠাকুরের এই পরম বাৎসল্যভাব দর্শন ক'রে বিস্মিত হন।

আর একটি ঘটনা। ঘটনাটি কাশীপুর পর্বে জনৈকা উন্মাদিনী মহিলা-ভক্ত-সংক্রান্ত এবং বৈচিত্র্যে ভরা।

ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন, মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী একদা এক সুগায়িকা মহিলা-ভক্তকে ঠাকুরের সান্নিধ্যে এনেছিলেন। মহিলাটি সুন্দর ভক্তি-মূলক গান গাইতেন বটে, কিন্তু তাঁর হাবভাব একটু অস্বাভাবিক থাকায়, সবাই তাঁকে 'পাগলী' ব'লে ডাকত। তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে যেতেন এবং সব সময়েই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তায় বিভোর থাকতেন। একদিন দক্ষিণেশ্বরে এই পাগলিনী ঠাকুরের কাছে গিয়ে হঠাৎ কাঁদতে শুরু করায় ঠাকুর তাঁকে প্রশ্ন ক'রে জেনেছিলেন যে তাঁর 'মধুরভাব' এবং সেই মধুরভাবেই তিনি ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্টা। কিন্তু ঠাকুরের মাতৃভাবের সাধনের কথা শুনেও পাগলিনী তাঁকে ছাড়তে চাইতেন না, বরং খুব উপদ্রব ক'রে তাঁর করুণা ভিক্ষা চাইতেন! এই ঘটনায় ঠাকুর তাঁর প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে তিরস্কার করায়, শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী পাগলিনীকে তাঁর নহবত ঘরে ডাকিয়ে ঐরূপ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য উপদেশ দিলেও বিশেষ ফল হয়নি।

পরবর্তীকালে অসুস্থ অবস্থায় ঠাকুর যখন কাশীপুরে অবস্থান করছিলেন, তখন এই পাগলিনী কাশীপুরেও যাতায়াত শুরু করেন এবং অসুস্থ ঠাকুরকে পূর্বের মত খুব বিব্রত করতে থাকেন। কাশীপুরের বাগানে তিনি দৌড়ে গিয়ে ঠাকুরের ঘরে তাঁকে দেখার জন্য মাঝে মাঝে ঢুকে পড়তেন এবং সেজন্য কোন কোন ভক্তের কাছে মাঝে মাঝে প্রহারও পেতেন। পাগলিনীর প্রচণ্ড উপদ্রবে অসুস্থ ঠাকুরের খুব কষ্ট হতে থাকায় ঠাকুরের তরুণ ভক্তেরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন; কিন্তু ঠাকুর করুণামাখা হৃদয়ে ভক্তদের নিবৃত্ত করতেন, যাতে পাগলিনীকে বাধা দেওয়া না হয়। এরপর পাগলিনী কেবল ঠাকুরকে নমস্কার ক'রে ভক্তদের ভয়ে চ'লে যেতেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই এই পাগলিনীকে নিয়ে একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। তিনি একদিন হঠাৎ অসুস্থ ঠাকুরকে পুনরায় এমন মাত্রাতিরিক্ত বিরক্ত করেন যে, অসহায় ঠাকুর অতঃপর ভক্তদের আদেশ করেন যে, পাগলিনীকে যেন পুলিশের হেফাজতে রেখে আসা হয়। তখন দুই তরুণ ভক্ত (পরবর্তীকালে স্বামী অভেদানন্দ ও স্বামী নিরঞ্জনানন্দ) পাগলিনীকে ধ'রে নিকটবর্তী কাশীপুর থানায় জমা দিয়ে আসেন। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে থানা থেকে তাঁকে ছেড়ে দিতেই, পাগলিনী পুনরায় কাশীপুর-উদ্যানে ফিরে আসেন। কিন্তু পাগলামীর বদলে তিনি এই সময় ঠাকুরের কাছে গিয়ে সুমধুর কণ্ঠে এমন একটি মাতৃসঙ্গীত ঠাকুরকে শোনান যে,

তাতে ঠাকুর সমাধিস্থ হন। কিন্তু অসুস্থ শরীরে ঠাকুরের সমাধি উচিত নয় বিবেচনা ক'রে, সেইদিনই তরুণ নিত্যনিরঞ্জন কাঁচি দিয়ে পাগলিনীর লম্বাচুল খানিকটা কেটে দিলে, তিনি চিরদিনের মত কাশীপুর ছেড়ে চ'লে গিয়েছিলেন এবং আর কোনদিন তাঁকে দেখা যায়নি। এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে, ভক্তপ্রবর গিরিশচন্দ্র একদা কাশীপুরে ঠাকুরকে এই পাগলিনীর সম্পর্কে বলেছিলেন —'সে পাগলী ধন্য! পাগল হোক আর ভক্তদের কাছে মারই খাক, আপনাকে তো অষ্টপ্রহর চিন্তা ক'রেছে! সে যে-ভাবেই করুক, তার কখনও মন্দ হবে না।

* * *

এইরকম নানা অসাধারণ ঘটনার মাধ্যমে কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণলীলার জমজমাট আসরের সৃষ্টি—যার প্রতিটি বর্ণনা করা অসম্ভব, আবার সবগুলির উল্লেখও সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাদিতে অনুপস্থিত। তবু যেটুকু পাওয়া যায়, তার মধ্য থেকেই কয়েকটি মাত্র ঘটনা বেছে নেওয়া হয়েছে ঠাকুরের বিভিন্নমুখী লীলার রসাস্বাদনের জন্য। এইরকম এক বিশেষ লীলা—'কল্পতরু', যা অবতার-শরীরে দেবভাব এবং মানবভাবের অপূর্ব সম্মিলন।

১৮৮৬ সালের ১লা জানুয়ারী অপরাহ্নে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে যেদিন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ 'কল্পতরু' রূপে গৃহীভক্তদের কৃপাদান ক'রেছিলেন, সেদিনটি ছিল সমগ্র বিশ্ববাসীর আধ্যাত্মিক জগতে এক স্মরণীয় দিন; গৃহীভক্তদের কাছে যেমন দুর্লভ চৈতন্যলাভের দিন, ত্যাগীভক্তদের উপলব্ধিতে এটি ভগবানের আত্মপ্রকাশে অভয়দানের একটি পরম দিন। সুতরাং তথ্যের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই এবিষয়ে একটু তত্ত্বগত আলোচনারও প্রয়োজন আছে।

দীর্ঘদিন রোগভোগের পর, এই একটি দিনই সকল নিষেধ উপেক্ষা ক'রে অসুস্থ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পূর্ণ স্বাভাবিকরূপে কাশীপুর উদ্যানবাটীর দোতলা থেকে একাকী উদ্যানে নেমে এসে সমবেত গৃহীভক্তদের চৈতন্যদানের দ্বারা, স্পর্শের দ্বারা প্রত্যক্ষ কৃপা ক'রেছিলেন। গৃহীভক্তেরা তাই এই বিশেষ দিনটিকে 'কল্পতরু' দিবসরূপে প্রতিবছর স্মরণ করেন, আর ত্যাগীভক্তেরা এটিকে ঠাকুরের 'আত্মপ্রকাশে অভয়দান' দিবসরূপে অভিহিত করেন।

এই বিশেষ দিনটির বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থে যে সব উল্লেখ আছে, সেগুলিকে একত্র সংগ্রহ ক'রে সেদিনের মোটামুটি একটি চিত্র অঙ্কনের চেষ্টা করা হল।

স্থান—কাশীপুর উদ্যানবাটী; দিন—১৮৮৬ সালের ১লা জানুয়ারী; সময়—

অপরাহ্ণ প্রায় তিনটা। ঠাকুর দুপুরে বিশ্রামের পর ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালকে তাঁর উদ্যানে ভ্রমণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন এবং রামলালও তৎক্ষণাৎ সে বিষয়ে মনোযোগী হন। ঠাকুরের পরিধানে তখন ছিল একটি লালপেড়ে ধুতি, একটি সবুজ রঙের পিরান, লালপাড় বসানো একখানি মোটা চাদর, সবুজ বনাতের কান-ঢাকা টুপী, পায়ে মোজা ও চটিজুতো ; অর্থাৎ প্রায় সর্বাঙ্গ আবৃত। ঠাকুর যখন রামলালকে ধ'রে বাড়ির দোতলা থেকে একতলায় নেমে আসেন, তখন একতলার হলঘরের পাশের ছোট ঘরে নরেন্দ্রাদি কয়েকজন সেবক নিদ্রিত ছিলেন ; কারণ, পূর্বরাত্রে ঠাকুরের সেবা অথবা সাধনভজনের দরুন রাত্রিজাগরণের ফলে তাঁরা ক্লান্ত ছিলেন। ঠাকুরের কিছু বহিরাগত ভক্ত সেদিন উদ্যানে যেমন বেড়াচ্ছিলেন, তেমনি এই হলঘরেও কয়েকজন বসেছিলেন। ঠাকুর হলঘরের পশ্চিমদিকের দরজা দিয়ে বহির্গত হয়ে সুরকির রাস্তা ধ'রে ধীরে ধীরে দক্ষিণদিকের ফটকের দিকে অগ্রসর হন। ঠাকুরকে অসুস্থ শরীর নিয়ে হঠাৎ নীচে নাম্‌তে দেখে, উপস্থিত কয়েকজন ভক্তও তাঁকে অনুসরণ করেন ; সেবক লাটুও ঠাকুরকে একটু অনুসরণ ক'রে অন্যান্য ভক্তদের তাঁর সঙ্গে দেখে, নিকটস্থ পুষ্করিণীর দক্ষিণ পাড় অবধি এসে ফিরে গিয়ে ঠাকুরের বসবাসের ঘরখানি ইত্যবসরে পরিষ্কার ও বিছানাপত্র রৌদ্রে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন,—সঙ্গে সেবক শরৎচন্দ্রও (স্বামী সারদানন্দ) তাঁকে এই বিষয়ে সাহায্য করেন।

ইংরাজী বছরের প্রথম দিন হিসাবে সেদিন ছুটি থাকায়, বাইরে থেকে প্রায় ত্রিশজনের অধিক ভক্ত উদ্যানে এসেছিলেন ছুটি উপভোগ করতে এবং ঠাকুরের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে সেদিন সেইভাবে উদ্যানে একাকী বেড়াতে দেখে উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর প্রাণে আনন্দের জোয়ার আসে এবং তাঁরা সবাই ঠাকুরকে অনুসরণ ক'রতে থাকেন। ঠাকুরের এই সময়কার রূপ বর্ণনা ক'রে ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত তাঁর 'পরমহংসদেবের জীবন বৃত্তান্ত'-গ্রন্থে লিখেছেন—"সেইদিনকার রূপের কথা স্মরণ হইলে আমরা এখনও আশ্চর্য হইয়া থাকি। তাঁহার সর্বশরীর বস্ত্রাবৃত এবং মস্তকে সবুজ বনাতের কান-ঢাকা টুপী ছিল, কেবল মুখমণ্ডলের জ্যোতিতে দিঙ্‌মণ্ডল আলোকিত হইয়াছিল। মুখের যে অত শোভা হইতে পারে, তাহা কাহারও জানা ছিল না।"

সেদিনের এই রূপবর্ণনায় ভক্ত কবি অক্ষয়কুমার সেন তাঁর রচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি'-গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন :—

"শ্রীঅঙ্গের মধ্যে খোলা বদনমণ্ডল।
কান্তিরূপে লাবণ্যেতে করে ঝলমল॥

দারুণ বিয়াধি-ভোগে শীর্ণ কলেবর।
কিন্তু বয়ানেতে কান্তি বহে নিরন্তর ॥
মনে হয় অঙ্গবাস সব দিয়া খুলি।
নয়ন ভরিয়া দেখি রূপের পুতুলি ॥"

*　　　*　　　*

সেদিন বসতবাটী ও ফটকের মাঝামাঝি ঠাকুর এসে পৌছলে, গিরিশচন্দ্র, রামচন্দ্র প্রভৃতি ঠাকুরের কাছে এসে উপস্থিত হন। তাঁদের দেখে ঠাকুর অকস্মাৎ গিরিশচন্দ্রকে প্রশ্ন করেন—'তুমি যে আমার সম্বন্ধে এত ব'লে বেড়াও, তুমি কি দেখেছ বা কি বুঝেছ'? ঠাকুরের এই আকস্মিক প্রশ্নে গিরিশচন্দ্র কোনরূপ বিচলিত না হয়ে, তৎক্ষণাৎ রাস্তার ওপরেই ঠাকুরের পদতলে জানু পেতে উপবিষ্ট হয়ে দুটি হাত জোড় ক'রে গদ্গদ স্বরে অগাধ বিশ্বাসে উত্তর দেন—'ব্যাস বাল্মীকি যাঁর ইয়ত্তা করতে পারেননি, আমি তাঁর সম্বন্ধে বেশী কি আর বলতে পারি!' গিরিশচন্দ্রের এই কথা শোনামাত্রই ঠাকুরের সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয় এবং তিনি গভীর ভাবসমাধিতে মগ্ন হন। তাঁর সেইসময়কার অপরূপ দিব্যভাব এবং অভূতপূর্ব রূপমাধুর্য দর্শন ক'রে সমবেত ভক্তগণ মুগ্ধ হন এবং গিরিশচন্দ্র মহা উল্লাসে বারবার 'জয় রামকৃষ্ণ' ধ্বনি দিয়ে ঠাকুরের চরণধূলি গ্রহণ করতে থাকেন।

অতঃপর ঠাকুর বাহ্যদশায় ফিরে এসে, সহাস্যবদনে সকল ভক্তের প্রতি কৃপা-দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে—'চৈতন্য হোক',—এই আশীর্বাদ উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই আবার ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েন। এই সময় ভক্তেরা ভাবের উচ্ছ্বাসে ঠাকুরের জয়ধ্বনি দিয়ে ঠাকুরের শ্রীচরণে প্রণাম করতেই তিনি ভাবাবস্থাতেই ভক্তদের বক্ষ স্পর্শ ক'রে একে একে সকলকে—'তোমাদের চৈতন্য হোক'—এই আশীর্বাদ করতে থাকেন। এই সম্পর্কে একটি বর্ণনায় স্বামী সারদানন্দ তাঁর 'লীলাপ্রসঙ্গ'-গ্রন্থের ৫ম খণ্ডে লিখেছেন—"স্বার্থগন্ধহীন তাঁহার সেই গভীর আশীর্বাণী প্রত্যেকের অন্তরে প্রবল আঘাত প্রদানপূর্বক আনন্দস্পন্দনে উদ্বেল করিয়া তুলিল। তাহারা দেশ কাল ভুলিল, ঠাকুরের ব্যাধি ভুলিল, ব্যাধি আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাকে স্পর্শ না করিবার তাহাদের ইতিপূর্বের প্রতিজ্ঞা ভুলিল এবং সাক্ষাৎ অনুভব করিতে লাগিল, যেন তাদের দুঃখে ব্যথিত হইয়া কোন এক অপূর্ব দেবতা হৃদয়ে অনন্ত যাতনা ও করুণা পোষণপূর্বক বিন্দুমাত্র নিজ প্রয়োজন না থাকিলেও, মাতার ন্যায় তাহাদিগের স্নেহাঞ্চলে আশ্রয় প্রদান করিতে ত্রিদিব হইতে সম্মুখে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে সস্নেহে আহ্বান করিতেছেন! তাঁহাকে প্রণাম ও তাঁহার পদধূলি গ্রহণের জন্য তাহারা তখন ব্যাকুল হইয়া

উঠিল এবং জয়রবে দিক মুখরিত করিয়া একে একে আসিয়া প্রণাম করিতে লাগিল। ঐরূপে প্রণাম করিবার কালে ঠাকুরের করুণাব্ধি আজি বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া এক অদৃষ্টপূর্ব ব্যাপার উপস্থিত করিল। কোন কোন ভক্তের প্রতি করুণায় ও প্রসন্নতায় আত্মহারা হইয়া দিব্য শক্তিপূত স্পর্শে তাহাকে কৃতার্থ করিতে আমরা ইতিপূর্বে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে প্রায় নিত্যই দেখিয়াছিলাম, অদ্য অর্ধবাহ্যদশায় তিনি সমবেত প্রত্যেক ভক্তকে ঐভাবে স্পর্শ করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার ঐরূপ আচরণে ভক্তগণের আনন্দের অবধি রহিল না। তাহারা বুঝিল, আজি হইতে তিনি নিজ দেবত্বের কথা শুদ্ধ তাহাদের নিকট নহে, কিন্তু সংসারে কাহারও নিকট আর লুক্কায়িত রাখিবেন না এবং পাপী-তাপী সকলে এখন হইতে সমভাবে তাঁহার অভয়পদে আশ্রয়লাভ করিবে—নিজ নিজ ত্রুটি, অভাব ও অসামর্থ্য-বোধ হইতে তদ্বিষয়েও তাহাদিগের বিন্দুমাত্র সংশয় রহিল না। সুতরাং ঐ অপূর্ব ঘটনায় কেহবা বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে অক্ষম হইয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহাকে কেবলমাত্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, কেহবা গৃহমধ্যস্থ সকলকে ঠাকুরের কৃপালাভে ধন্য হইবার জন্য চিৎকার করিয়া আহ্বান করিতে লাগিল, আবার কেহবা পুষ্পচয়নপূর্বক মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে ঠাকুরের অঙ্গে উহা নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ ঐরূপ হইবার পরে ঠাকুরের ভাব শান্ত হইতে দেখিয়া ভক্তগণও পূর্বের ন্যায় প্রকৃতিস্থ হইল এবং অদ্যকার উদ্যান-ভ্রমণ ঐরূপে পরিসমাপ্ত করিয়া তিনি বাটীর মধ্যে নিজকক্ষে যাইয়া উপবিষ্ট হইলেন।"

এইদিনকার ঘটনা সম্পর্কে স্বামী অভেদানন্দ তাঁর 'আমার জীবনকথা'-গ্রন্থে উল্লেখ ক'রেছেন—"শ্রীশ্রীঠাকুর কল্পতরু হইয়াছিলেন ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী। সকল অফিসের ছুটির দিন থাকায় ঐদিন বৈকালে গিরিশ ঘোষ প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্তগণ কাশীপুর বাগানে আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সেইদিন পূর্বাপেক্ষা সুস্থ অনুভব করিয়া একাকী সেবক-যুবকদিগকে কিছু না বলিয়া নীচে নামিয়া বাগানে পদচারণা করিতে লাগিলেন। গৃহস্থ-ভক্তগণ তাঁহাকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া পদধূলি লইতে আরম্ভ করিল। শ্রীশ্রীঠাকুর বাহ্যজ্ঞানশূন্য ও ভাবাবিষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর সংজ্ঞালাভ করিয়া সকলকে আশীর্বাদ করিতে করিতে বলিলেন, 'তোমাদের চৈতন্য হোক্! তোমাদের চৈতন্য হোক্!' কাহাকেও বা স্পর্শ করিয়া তাহার অধ্যাত্মনেত্র খুলিয়া দিলেন এবং যে যাহা প্রার্থনা করিল, তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, 'তোর হবে'।

"ভাই ভূপতি সমাধি প্রার্থনা করিয়াছিল। তাহাকে শ্রীশ্রীঠাকুর কৃপা করিয়া

বলিয়াছিলেন, 'তোর সমাধি হবে'। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বসুমতী সাহিত্য-মন্দিরের) অত্যন্ত গরীব অবস্থায় অর্থাভাবে কষ্ট পাইতেছিল বলিয়া অর্থ প্রার্থনা করিয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাকে কৃপা করিয়া বলিলেন, 'তোর অর্থ হবে'। রামলালদাদা, বৈকুণ্ঠ সান্যাল প্রভৃতি গৃহস্থ-ভক্তদিগকে তাহাদের যাহা যাহা প্রার্থনা ছিল, তাহা তিনি আশ্বাস দিয়া 'পূর্ণ হবে' বলিয়া কৃপা করিলেন। ভক্ত গিরিশচন্দ্র, দত্ত রামচন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসকলকে ডাকিয়া বলিলেন, 'তোরা কে কোথায় আছিস আয়, আজ শ্রীশ্রীঠাকুর কল্পতরু হয়েছেন এবং সকলকে বর দিচ্ছেন।' কিন্তু যুবক-সেবকগণ সেই সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরের কার্যে ব্যস্ত ছিল, সেইজন্য তাহারা নীচে বাগানপথে উপস্থিত ছিল না। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহার পর রামলাল-দাদাকে বলিলেন, 'শালাদের (সকল ভক্তদের) পাপ নিয়ে আমার অঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে। গঙ্গাজল নিয়ে আয়, গায়ে মাখি।' রামলালদাদা গঙ্গাজল আনিলে শ্রীশ্রীঠাকুর তাহা গ্রহণ করিয়া সর্বাঙ্গে ছড়াইয়া দিলে তবে জ্বালার নিবারণ হইল।"

এই হ'ল কল্পতরু দিবসের মূল ঘটনা।

এবার এই 'কল্পতরু' দিবস, বা 'আত্মপ্রকাশে অভয়দান' দিবস সম্পর্কে তত্ত্বগত আলোচনা করা যেতে পারে। কারণ, এটি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তলীলার এক বিশেষ প্রকাশ। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণকে মানুষরূপে চিন্তা না ক'রে, স্বয়ং ঈশ্বররূপে ধারণা করা ছাড়া এই 'কল্পতরু' দিবসের তাৎপর্য উপলব্ধি করা কঠিন।

গীতায় উল্লেখ আছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গ অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছিলেন। এই বিশ্বরূপ শ্রীভগবানের বিশেষ 'বিভূতি'। আমরা সাধারণত সাধকপুরুষদের জীবনে যে বিভূতির পরিচয় পাই, তা প্রকৃতপক্ষে তাঁদের 'সিদ্ধাই'—অর্থাৎ সাধনায় বা দৈবকৃপায় সিদ্ধিলাভের পর ঐশী শক্তির বিকাশ। কিন্তু অবতারপুরুষদের জীবনে এই 'সিদ্ধাই'য়ের স্থান নেই; তাঁদের জীবনের যে ঘটনাগুলি আমাদের কাছে ধারণার অতীত, সেইগুলিই 'বিভূতি'। এই বিভূতি কখনও স্বতঃই প্রকাশিত হয়, আবার কখনও প্রয়োজনবোধে প্রকাশ করতেও তাঁদের দেখা যায়। সাধারণ অর্থে—ভগবানের স্বরূপশক্তির সমধিক বিকাশকেই বিভূতিরূপে গণ্য করা হয়। শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ এই বিভূতির বিকাশ,—এটি কোন সিদ্ধাই নয়। শ্রীভগবানের ক্ষেত্রে যা বিভূতি, মানুষের ক্ষেত্রে তা নয়, যদিও মানুষের সিদ্ধাইকে বিভূতিরূপে অজ্ঞানতাবশতঃ উল্লেখ করা হয়। মহাভারতে বা ভাগবতের নানা স্থানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নানা বিভূতির উল্লেখ আছে এবং গীতাতেও 'বিভূতিযোগ' নামে একটি অধ্যায় আছে। গীতায় শ্রীভগবান অর্জুনকে

বলছেন—'আমি একাংশে এই চরাচরে বিশ্ব ব্যাপিয়া আছি, আমি বিশ্বরূপ'। সুতরাং এই চরাচর বিশ্ব যদি ভগবানের এক অংশ হয়, তবে বাকী অংশ সম্পর্কে ধারণা করাও জীবের পক্ষে অসাধ্য। তাই ভগবানের শ্রীমুখে তাঁরই অচিন্তনীয়-বিভূতির কথা শোনার পর, অর্জুনের সেই বিভূতি দর্শনের আগ্রহ উপস্থিত হয়। ভক্তের বাসনা চরিতার্থের জন্যই তখন অর্জুনকে ভগবান 'দিব্যচক্ষু' দান করেন এবং বিশ্বরূপ দর্শন করান। সেই 'রূপ' অনির্বচনীয়, অদৃষ্টপূর্ব, সর্ব্বতঃপূর্ণ এবং সর্বব্যাপী,—যার আদি নেই, অন্ত নেই, মধ্য নেই, অথচ সবই আছে। অর্জুন সেই দৃশ্য চর্মচক্ষে দর্শন করেননি, দিব্যচক্ষে দর্শন করেছিলেন। কিন্তু তা সত্বেও অর্জুন ভয়ে, বিস্ময়ে, কম্পিত কলেবরে, আর্তকণ্ঠে যখন ভগবানকে সেই 'রূপ' সংবরণ করার জন্য আবেদন জানান, ভগবান তৎক্ষণাৎ তাঁর পূর্বের সৌম্যমূর্তি ধারণ ক'রে অর্জুনকে আশ্বস্ত করেন এবং বলেন যে, অনন্যা ভক্তি ছাড়া বিশ্বরূপের দর্শন হয় না। সুতরাং এই ঘটনায় বোঝা যায় যে, অর্জুনকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে উৎসাহদানের জন্য মানবদেহধারী স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন নানা উপদেশদান সত্বেও বিফল হন, তখনই প্রথমে তাঁর স্বীয় বিভূতির বর্ণনা এবং পরে তাঁর বিশ্বরূপ প্রদর্শনের দ্বারা অর্জুনের মনের সকল সংশয়কে নাশ করতে ভগবান অগ্রসর হন; অর্থাৎ প্রয়োজনবোধেই ভগবানকে বিভূতির আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

যুগ-অবতারগণের স্বরূপও বিশ্বরূপেরই পরোক্ষ প্রকাশ। বিশ্বরূপের প্রত্যক্ষ প্রকাশকে যেমন ভগবানের অন্তরঙ্গ হওয়া সত্বেও অর্জুন সহ্য করতে পারেননি, তেমনি যুগ-অবতারগণের প্রত্যক্ষ প্রকাশকেও সাধারণ জীবের পক্ষে সহ্য করা, বা ধারণা করা একেবারেই অসম্ভব। তাই সেই স্বরূপ, বা বিশ্বরূপ, বা বিভূতি দর্শন করা সাধারণ জীবের সাধ্যের অতীত। প্রকৃতপক্ষে, গীতায় শ্রীভগবান নির্দেশিত অনন্যা ভক্তি ছাড়া এই 'রূপ' দর্শন করা যায় না। তাই ভগবান স্বরূপ গোপন রেখে ছদ্মবেশে অবতীর্ণ হন এবং তাঁর এই অবতারলীলাকে 'প্রচ্ছন্নলীলা' বলা হয়। সেজন্যই, একদা যুগ-অবতার শ্রীচৈতন্যদেব যখন বাসুদেব সার্বভৌমকে ষড়ভুজে দর্শন দ্বারা নিজের বিভূতি প্রকাশ করেছিলেন, তখন সার্বভৌম মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। যুগ অবতার শ্রীরামকৃষ্ণ এবার এ-বিষয়ে একটু বিশেষ সতর্ক ছিলেন। তাই কাশীপুর উদ্যানবাটীতে 'কল্পতরু'র দিনে, তিনি তাঁর দেহের বাহ্য মানবরূপ অপরিবর্তিত রেখেই, তাঁর অন্তরের দিব্যরূপ সমাগত সকল ভক্তকেই দর্শন করিয়েছিলেন। কারণ, যে-ক্ষেত্রে অন্তরঙ্গেরাই ভগবান বা অবতারের বিশ্বরূপ, বা অদৃষ্টপূর্ব বাহ্যরূপ দর্শন ক'রে মূর্ছিত হয়ে পড়েন, সে-ক্ষেত্রে বহিরঙ্গের ভক্তেরা কীভাবে সেই বিভূতি গ্রহণ করবেন? তাই শ্রীরামকৃষ্ণ-অবতার

লীলায় বাহ্যিক বিভূতির কোন ঠাঁই নেই, শুধু আত্মিক বিভূতির উন্মোচন ; বাহ্যরূপের বদলে অন্তরের রূপ প্রদর্শন।

সেই বিশেষ দিনে ঠাকুরের স্পর্শে ভক্ত অক্ষয়কুমার সেনের দেহ সাময়িক বিকৃতিলাভ ক'রেছিল, অনেক ভক্তের মনে বিস্ময় জাগ্রত হয়েছিল, কেউ বা কিছুদিনের জন্য অস্বাভাবিক জীবনপরিক্রমার সম্মুখীন হয়েছিলেন—প্রভৃতি কয়েকটি আপাতঃ অবাঞ্ছিত ঘটনার কথাও শোনা যায়। তবু সেদিন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ খুবই শান্ত ছিলেন এবং ভক্ত গিরিশচন্দ্র ছাড়া সর্বসমক্ষে আর কাকেও প্রশ্ন ক'রে নিজের অবতারত্ব জানবার চেষ্টা করেননি। (প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করা দরকার যে, সেদিন এই ঘটনার সময় গৃহীভক্তগণ ছাড়া কোন ত্যাগীভক্ত সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।) গিরিশচন্দ্রও ঠাকুরের এই অভূতপূর্ব বিভূতি দর্শন ক'রে যথাযথ বলেছিলেন যে, ব্যাস-বাল্মীকি যাঁর ইয়ত্তা করতে অক্ষম, তিনি সেই অবতারপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে কী বলবেন ?—অর্থাৎ, গিরিশচন্দ্রও শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরের বিভূতি উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেই উপলব্ধির মাধ্যমে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত বিশ্বরূপ দর্শনই করেছিলেন। অবশ্য ইতিপূর্বে এই কাশীপুরেই ঠাকুর একদা তাঁর কণ্ঠ থেকে নির্গত পুঁজ-রক্তাদি গিরিশচন্দ্রকে দর্শন করিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, অবতারের 'ক্যান্সার' হয় কিনা। ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্রও কিছুমাত্র ইতস্তত না ক'রে উত্তর দিয়েছিলেন—'এবারে এসব খেয়ে কীট-পিপীলিকা পর্যন্ত উদ্ধার হয়ে যাবে, তাই এই রোগ।'

পূর্বেই বলা হয়েছে, ১লা জানুয়ারী এই বিশেষ দিনটিতে ভক্তপ্রবর গিরিশচন্দ্রের অন্তরের এই সরল বিশ্বাসে, সেদিন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ মুগ্ধ হন এবং ভাবাবিষ্ট অবস্থায় সমবেত ভক্তদের 'তোমাদের চৈতন্য হোক'—ব'লে আশীর্বাদ করেন ও স্পর্শদ্বারা কৃপা করেন। এই অপূর্ব স্পর্শে ভক্তগণ প্রথমে মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁকে নিরীক্ষণ করেন এবং পরে আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়েন।

প্রকৃতপক্ষে, সেদিন গৃহীভক্তেরা ভগবানের বিশ্বরূপই পরোক্ষভাবে দর্শন করেছিলেন ; কারণ, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অন্তরের অভিব্যক্তি দ্বারা, ভক্তদের নিজ নিজ অন্তশ্চক্ষুর মাধ্যমে তাঁর স্বরূপ দর্শন করিয়েছিলেন। তাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ভক্তেরা এটিকে 'কল্পতরু' না ব'লে, ঠাকুরের 'আত্মপ্রকাশে অভয় দান' নামে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু গৃহীভক্তেরা, বিশেষতঃ ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্ত এটিকে 'কল্পতরু' আখ্যা দিয়েছিলেন, সেইজন্যই গৃহীদের দেওয়া নামেই ঐদিনটি স্মরণ ক'রে 'কল্পতরু' দিবস পালন করা হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ত্যাগী ভক্তদের কাছে ঠাকুরের আত্ম-

প্রকাশকে গ্রহণ করা যতটা সহজ, গৃহীভক্তদের কাছে 'কল্পতরু' রূপে ঠাকুরকে বরণ করা তেমনি সহজ। 'আত্মপ্রকাশ' কথাটি জ্ঞানমার্গের দ্বারা যতটা উপলব্ধি করা যায়, 'কল্পতরু' কথাটিও তেমনি ভক্তিমার্গের দ্বারা সহজভাবে গ্রহণ করা যায়। 'কল্পতরু' একটি অভিষ্ট ফলদায়ক স্বর্গীয় বৃক্ষ এবং সেই বৃক্ষের কাছে যা চাওয়া যায়, তা-ই পাওয়া যায়। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে যে, সেদিন গৃহীভক্তেরা ঠাকুরের কাছে কিছু চেয়েছিলেন কিনা! ঘটনায় দেখা যায়, যদিও মাত্র ২।১ জন ঠাকুরের কাছে তাঁদের মনোবাসনা জানিয়ে কাঙ্ক্ষিত ফল-লাভ করেছিলেন, ঠাকুর কিন্তু নির্বিচারে সকলকে 'তোমাদের চৈতন্য হোক'—এই অপার্থিব সম্পদটি দান করেছিলেন। ঠাকুরের এই দানটি অযাচিত হলেও, তিনি এক বিশেষ অর্থে নিশ্চয়ই 'কল্পতরু'। কারণ, অন্তরে অন্তরে সকল ভক্তেরই চরম বাসনা ছিল—ঠাকুর আবার সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে উঠুন এবং পূর্বের ন্যায় তাঁদের কৃপা করুন। ভক্তদের কাছে ঠাকুরের এই অসুস্থতা দুর্বিষহ হয়ে উঠে-ছিল; তাঁরা ঠাকুরকে সব সময় দর্শন থেকে বঞ্চিত ছিলেন, তাঁর শ্রীচরণ স্পর্শ থেকেও বঞ্চিত ছিলেন। এই বঞ্চিত ভক্তদের চরম বাসনা, প্রাণের কামনা, গভীর আকুতি—অন্তর্যামী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরকে স্পর্শ করেছিল এবং সেই কামনা চরিতার্থের জন্যই তিনি সেদিন সুস্থ স্বাভাবিকরূপে কাশীপুরের উদ্যানবাটীর ওপরতলা থেকে নেমে এসে ভক্তদের সেই গোপন অভিলাষকে পূর্ণ করেছিলেন, সুতরাং সেই বিশেষ অর্থে তিনি 'কল্পতরু'। ভক্তদের অন্তরের নীরব কামনায় ভগবান সাড়া দেওয়ায়, তাঁরা সরবে 'জয় রামকৃষ্ণ' ধ্বনিতে সেদিন আকাশ-বাতাস মুখরিত ক'রেছিলেন। তাই, এই 'কল্পতরু' প্রকৃতপক্ষে ভগ-বানের বিশ্বরূপেরই অঙ্গ। গৃহীভক্তদের মন অনেক ক্ষেত্রেই সন্দেহাকুল থাকে; তাঁরা সাধারণতঃ কোন বিভূতি বা অলৌকিক কিছু দর্শন করলে তবে ভগবৎ-বিশ্বাসী হন। পাছে গৃহীভক্তেরা সংশয়যুক্ত মনে আধ্যাত্মিক জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন, তাই তাঁদের রক্ষার জন্যই,—তাঁদের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যই ভগ-বানকে প্রয়োজনবোধে মাঝে মাঝে বিভূতি প্রদর্শন করতে হয়। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষ—না অবতার, এই সংশয় অনেক গৃহীভক্তদের মনে মাঝে মাঝে উঁকি দিত; তাই অসুস্থ শরীরকে সাময়িক স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে ঠাকুর তাঁর বিভূতি দর্শন করান। এমনকি, এই সংশয় দূর করার জন্য তাঁর ত্যাগী সন্তান ও প্রধান পার্ষদ স্বামী বিবেকানন্দের কাছেও স্বীয় মুখে তাঁর আত্মপরিচয় দিতে হয়েছিল। ১৮৮৬ সালের ১লা জানুয়ারীতে যদি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর তেজোময়, অনন্ত, আদ্য, বিশ্বাত্মক পরমরূপ আংশিকভাবেও গৃহীভক্তদের প্রদর্শন

করতেন, তবে সবাই যে অচৈতন্য হয়ে পড়তেন, একথা বলাই বাহুল্যমাত্র। কারণ, ত্যাগী ভক্ত স্বামী বিবেকানন্দও একদা ঠাকুরের দৈবস্পর্শ সহ্য করতে না পেরে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন এবং অর্জুনের মতই ভয়ে, বিস্ময়ে ঠাকুরকে সেই শক্তি সংবরণ করার জন্য ক্রন্দন করতে করতে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। অশেষ শক্তিধর স্বামী বিবেকানন্দের যদি এই অবস্থা হয়, তবে গৃহীদের না জানি সেই ঘটনায় কী অবস্থা হত! অনুরূপ অবস্থার সামান্যতম রেশ 'কল্পতরু' দিবসের পরেও ঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত ভক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালের মধ্যে বিদ্যমান থাকায়, তিনি সেই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করেন এবং স্বামী সারদানন্দের কাছে স্বীকার করেন, "অর্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ দেখিয়া ভয় পাইয়া কেন উহা প্রতি-সংহারের জন্য তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিদাভাস হৃদয়ঙ্গম হইল।" (লীলাপ্রসঙ্গ—৫ম খণ্ড)

ঠাকুরের অন্তলীলার এই কল্পতরু-রূপের গূঢ়তত্ত্ব আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় বা শিক্ষা দেয়—সেদিন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ কৃপা ক'রে কাশীপুর উদ্যানবাটীর উপরতলা থেকে নীচে নেমে এসেছিলেন আমাদের জন্যই, যেমন ভূমা হয়েও তাঁর ভূমিতে অবতরণ জীবোদ্ধারের জন্যই। আমরা যখন ভগবানের কাছে যেতে অক্ষম, তখন আমাদের ব্যাকুলতায় ভগবানকেই নেমে আসতে হয় আমাদের কাছে প্রেম বিতরণের উদ্দেশ্যে। বিশ্বকবির ভাষায় তাই বলা যায়—

'তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর,
তুমি তাই এসেছ নীচে;
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে।'

আমাদের দীনতা, আমাদের দুঃখ, আমাদের অসামর্থ্য, আমাদের বেদনা স্বেচ্ছায় দূর করতেই তিনি উপর থেকে নীচে নামলেন, আমাদের মাঝে এলেন, আমাদের কৃপা করলেন, আমাদের আনন্দ দিলেন, নিজেও আনন্দ পেলেন, আবার উপরতলায় স্বস্থানে ফিরে গেলেন। ভগবান ও জীবের মধ্যে এই প্রেমের সম্পর্কটাই আসল সম্পর্ক এবং 'কল্পতরু' দিবসের বিশেষ তাৎপর্য এটাই।

*　　　*　　　*

এবার প্রশ্ন উঠতে পারে—ঠাকুর ভক্তদের কেবলমাত্র 'তোমাদের চৈতন্য হোক'—এই আশীর্বাদ করলেন কেন? বিষয়টি বুঝতে গেলে, প্রথমে 'চৈতন্য' কি এবং ঠাকুর কর্তৃক কেবলমাত্র গৃহীভক্তদের এই চৈতন্যদানের উদ্দেশ্য কি, তা ধারণা করা দরকার।

জ্ঞানমার্গে এই 'চৈতন্য' কথাটির অর্থ ব্যাপক ; তবে সংক্ষেপে এর অর্থ 'নিজেকে অর্থাৎ আত্মাকে জানা'। আত্মা জন্ম ও মৃত্যুহীন ; তাই এটি কোন যৌগিক বা মিশ্রিত পদার্থ নয়—এটি হ'ল স্বাধীন এক পৃথক সত্তা এবং সেইজন্যই তাকে সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না, যদিও এটি শুধু বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে পরিভ্রমণ করে। দেহসুখের উর্ধ্বে, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উর্ধ্বে যে জ্ঞান, সেটিই আত্মজ্ঞান বা চৈতন্য। এই অসাধারণ চৈতন্যশক্তির মাধ্যমে মানুষ নিজেকেই ব্রহ্মরূপে ধারণা করতে সক্ষম হয়, যেহেতু জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলনও এই শুভ চৈতন্যশক্তির দ্বারা সংঘটিত হয়। জীবনের উদ্দেশ্য মুক্তি—প্রধানতঃ এই ব্যাখ্যা 'চৈতন্য' সম্পর্কে জ্ঞানমার্গে বিবৃত হয়েছে, যদিও জ্ঞানীরাও এক বিশেষ শ্রেণীর ভক্ত এবং জ্ঞানমিশ্রিত ভক্তিই তাঁদের অবলম্বন।

কিন্তু ভক্তিমার্গে এই চৈতন্যের বিশ্লেষণ কিছুটা পৃথক ; এখানে পূর্ণভক্তত্বই পূর্ণজীবত্ব এবং 'চৈতন্য' অর্থই 'প্রেমভক্তি'। ভক্ত ও ভগবানের দ্বৈতভাবের মধ্যে প্রেমভক্তি-সূত্র সংযুক্ত থাকায়, উভয়ের মধ্যে পরস্পর মিলনাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত থাকে। জীবমাত্রই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষরূপে 'নিত্যভক্ত' ও সেটিই জীবের স্বরূপ এবং ভক্তিই হ'ল জীবের স্বরূপগত ধর্ম :—সে কখনও মুক্তিকামনা করে না, ভক্তিতেই সে ডুবে থাকতে চায়, ভগবানের লীলামাধুর্য আস্বাদন করতে চায়, তাঁর লীলার সঙ্গী হতে চায়, সুখে-দুঃখে ভগবানকেই পেতে চায়—অথচ নিজে ভগবান হতে চায় না। যুক্তিদ্বারা নয়—ভক্তিদ্বারাই ভগবান লাভ হয়, এই আধ্যাত্মিক বোধকেই ভক্তিশাস্ত্রে সংক্ষেপে 'চৈতন্য' বলা হয়।

সেদিন ঠাকুর গৃহীভক্তদের যে চৈতন্যলাভের আশীর্বাদ করেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মানুষের কাছে সেই অমূল্য চৈতন্য ছিল আধ্যাত্মিকবোধের উন্মোচন। মায়াবদ্ধ জীব তার প্রকৃত স্বরূপ ও স্বধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার দরুন ভাগবানকে জানতে পারে না। তাই একথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হবে না যে, করুণাময় ঠাকুরের সম্ভবতঃ সেদিন উদ্দেশ্য ছিল—মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভক্তকে উপলক্ষ ক'রে জগতের সকল মানুষকে তার স্বরূপ ও স্বধর্ম সম্পর্কে অবহিত করা, যা একমাত্র চৈতন্যশক্তি তথা প্রেমভক্তির দ্বারাই সম্ভব। এই চৈতন্যসহায়ে মানুষ ভগবানের কাছে যাওয়ার পথ খুঁজে পায়, আবার এই চৈতন্যসহায়েই সে জানতে পারে—ভগবান তার কাছেই রয়েছেন নিজ প্রয়োজনে, যেমন সেদিন ভক্তদের সম্মুখেই নররূপী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দণ্ডায়মান ছিলেন। ভগবানের এই প্রয়োজনটি কি ? পরমাত্মার স্বরূপ ভগবান এবং ভক্তাত্মার স্বরূপ জীব—এই উভয়ের মিলন, পরস্পরের প্রয়োজনেই সংঘটিতহয়। জীবের ভগবানকে প্রয়োজন দুঃখনিবৃত্তি, পরাশান্তি

ও পরমানন্দ লাভের জন্য ; আর ভগবানের জীবকে প্রয়োজন কেবলমাত্র তাকে কৃপা করার জন্য নয়, তার সঙ্গে মিলনের জন্যও, এবং এই মিলনই মহামিলন। ভক্ত যেমন ভগবানকে প্রার্থনা করেন, ভগবানও তেমন ভক্তসঙ্গ আকাঙ্ক্ষা করেন, উপভোগ করেন। উভয়ের এই মহামিলনের মধ্যেই 'লীলা' প্রকাশিত হয়। ভক্তাধীন ভগবান, শরণাগত জীবকে নিজ প্রয়োজনেই উদ্ধার করেন। জীবের চৈতন্যলাভ হ'লে, তার স্বধর্ম অর্জিত হ'লে, তখন সে বোঝে, ভগবানও তাকে চান, তাকে ভালবাসেন, তার সম্মুখে সশরীরে আবির্ভূত হন।

সেদিনের ঘটনায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের মাঝে নেমে আসায় ভক্তিশাস্ত্রে নিহিত মহাসত্যের সেই শাশ্বত তত্ত্বেরই প্রত্যক্ষ প্রমাণ মেলে। 'চৈতন্য' হলেই আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব—ভগবান আছেন, আমাদের কাছেই আছেন, আমাদের রক্ষা করছেন, আমাদের ভালবাসছেন, আমাদের আকর্ষণ করছেন। এই চৈতন্য বা আধ্যাত্মিক বোধ থাকলে জীব সকল ব্যথা, দুঃখ, শোক, দারিদ্র্য, অভাব প্রভৃতিকে জয় ক'রে বা অবহেলা ক'রে শুদ্ধ সাত্ত্বিক ও নির্ভীক জীবনধারণের মাধ্যমে, প্রেমপূর্ণ চিত্তে ইহলোকেই পরম শান্তিতে বাস করতে সক্ষম হয়, যা সাধারণতঃ প্রতিটি মানুষেরই কাম্য। 'চৈতন্যলাভ' সম্পর্কে এই তত্ত্বটিই সহজবোধ্য।

* * *

এবার কাশীপুর পর্বে যে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হবে, সেগুলি ঠাকুরের প্রধান পার্ষদ নরেন্দ্রনাথ, তথা স্বামী বিবেকানন্দ সংক্রান্ত এবং সবগুলিই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রথমেই স্বামী অভেদানন্দের 'আমার জীবনকথা' গ্রন্থ থেকে একটি উদ্ধৃতি : —"১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ। নরেন্দ্রনাথ এই বৎসর আইন-পরীক্ষায় বি. এল. দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। সেইজন্য কলিকাতায় বাস করিয়া সে অধ্যয়ন করিত এবং মধ্যে মধ্যে কাশীপুর আসিত। এইদিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের অসুখ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে সেবা-শুশ্রূষা করিবার ইচ্ছাও তাহার বলবতী হইতে লাগিল। তখন নরেন্দ্রনাথ স্থির করিল যে, আইন-সংক্রান্ত পুস্তকগুলি কাশীপুর বাগানে আনিয়া সময়মত পাঠ করিবে ও শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা-শুশ্রূষা করিবে। আইন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সঙ্কল্প তাহার মনে দৃঢ় রহিয়াছে। কয়েকদিন এমন হইয়াছে যে, আইন-সংক্রান্ত পুস্তকপাঠে ব্যস্ত থাকার জন্য নরেন্দ্রনাথ উপরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিতে যাইতে পারে নাই। তাহারই মধ্যে একদিন সন্ধ্যার সময়ে উপরে নরেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিতে গিয়াছে। প্রণাম

করিয়া বসিলে শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে নরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিরে, তুই আর আমার কাছে আসিসনি কেন ?' নরেন্দ্রনাথ বলিল, 'মশাই, আইন-পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, পুস্তকপাঠে ব্যস্ত থাকি, তার জন্য উপরে আসার সময় পাই না।' ইহা শুনিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, 'দ্যাখ, তুই যদি উকিল হ'স তাহলে তোর হাতের জল আর আমি খেতে পারব না'। এই কথা শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ অতিশয় চিন্তিত হইল। আমিও সে-সময় উপস্থিত ছিলাম। দেখিলাম, নরেন্দ্রনাথ স্তব্ধ হইয়া গভীরভাবে কি চিন্তা করিতেছে। তাহার পর নরেন্দ্রনাথের মনে প্রশ্ন উঠিল, 'আমি এমন কাজ কেন করিব যাহাতে শ্রীশ্রীঠাকুর আমার হাতের জল খাইতে পারিবেন না! তাহা কখনই হইতে পারে না।' সে ভাবিতে ভাবিতে গম্ভীরভাবে নীচে হলের পার্শ্বের ছোট ঘরে যাইয়া আইন-সংক্রান্ত পুস্তকগুলি বন্ধ করিয়া আমাদের বলিল, 'আমার আইন-পরীক্ষা দেওয়া বোধ হয় আর হোল না।' আমরা শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলাম। হইল তাহাই। নরেন্দ্রনাথের মন হইতে আইন-পরীক্ষা দিবার ইচ্ছা ধীরে ধীরে একেবারে দূর হইয়া গেল। সে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা-শুশ্রূষার পর জপ, ধ্যান, সাধনাদিতে ডুবিয়া থাকিতে চেষ্টা করিল।"

* * *

কাশীপুর পর্বে একটি ঘটনার কথা স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, তাঁর 'স্বামী বিবেকান্দ'-গ্রন্থে লিখেছেন :—

"পিতার মৃত্যুর পর পরিবারের অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য নরেন্দ্রনাথ এটর্নীর শিক্ষানবিশীর কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন ; কিন্তু আইন পড়া চালিয়ে গেলেন। এ সময়েই রামকৃষ্ণের অসুস্থতার জন্য তিনি কাশীপুরে থাকতেন ; এ সময়ে তিনি অনেকদিন বাড়ির বাইরে ছিলেন। দীর্ঘদিন বাড়িতে না থাকায় মা চিন্তিত হয়ে অবশেষে একদিন কাশীপুরে গেলেন তাঁকে ফিরিয়ে আনবার জন্য। আমিও মা'র সঙ্গে গিয়েছিলাম ; আমার বয়স তখন মাত্র ছয়। আমাকে মা নিয়ে গেলেন রামকৃষ্ণের ঘরে। দ্বিতলের একটি প্রশস্ত ঘরের মাঝখানে শয্যায় অর্ধ-শায়িত অবস্থায় রামকৃষ্ণ তাকিয়ায় হেলান দিয়ে রয়েছেন। ঘরে ঢুকতেই তিনি আমাদের উভয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ডাক্তার আমাকে কথা বলতে নিষেধ ক'রেছেন। কিন্তু আপনার সঙ্গে আমাকে কথা বলতেই হবে। আপনি এসেছেন, ভালই হয়েছে। নরেনকে আপনার সঙ্গে ফিরিয়ে নিয়ে যান। গিরিশ ওরা সকলে মিলে ওকে সন্ন্যাসীর পোষাক পরিয়েছিল। কিন্তু আমি তখনই বাধা দিয়ে বলেছিলাম— 'তা' কেমন ক'রে হয় নরেন, তোমার বিধবা মা এবং একটি শিশু ভাই রয়েছে দেখবার। তোমার-তো সন্ন্যাসী হওয়া সাজে না।' এ কথার পর নরেন্দ্রনাথ মা

ও আমার সঙ্গে বাড়ির দিকে রওনা হলেন। আসবার সময় ঘোড়া গাড়িতে বসে মা নরেন্দ্রনাথকে রামকৃষ্ণের কথাগুলো বললেন। নরেন্দ্রনাথ উত্তরে বললেন,—'তিনি (রামকৃষ্ণ) চোরকে বলেন চুরি করতে এবং গৃহস্থকে বলেন সজাগ থাকতে।' ফেরবার পথে নরেন্দ্রনাথ কি একটা কাজে বাগবাজারে নেমে গিয়েছিলেন।"

* * *

কাশীপুর পর্বে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঠাকুরের আর একটি লীলার কাহিনী উল্লেখ ক'রেছেন স্বামী অভেদানন্দ তাঁর 'আমার জীবনকথা' গ্রন্থে। যথা :—"একদিন নরেন্দ্রনাথ ধ্যান করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল। তাহার এই জ্ঞান-শূন্যতা আসলে নির্বিকল্প সমাধি। নরেন্দ্রনাথ নির্বিকল্প-সমাধিতে মগ্ন হইয়া আনন্দ-সাগরে ভাসিতে লাগিল। তাহার পর আবার বার বার চেষ্টা করিয়াও ঐ অবস্থা আর ফিরাইয়া আনিতে পারিল না। তখন সে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট গিয়া বলিল, 'আপনি আমাকে সেই আনন্দসাগরে যাতে সর্বদা থাকতে পারি, দয়া ক'রে তাই ক'রে দিন।' শ্রীশ্রীঠাকুর ঈষৎ হাসিয়া আনন্দের সঙ্গে বলিলেন, 'এখন না, পরে হবে।' নরেন্দ্রনাথ ব্যগ্র হইয়া জিদ করিতে লাগিল এবং বলিল, 'আমার আর কিছুই ভাল লাগে না, সর্বদাই নির্বিকল্প-সমাধির অবস্থায় থাকতে ইচ্ছা হয়।' শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, 'সে ঘরের চাবি আমার হাতে। তুই এখন আমার কাজ কর, পরে সময় হ'লে আমি চাবি খুলে দেব। নইলে তুই তোর স্বরূপ জানতে পারলে, এই শরীরটা থু ক'রে ফেলে দিবি।' নরেন্দ্রনাথ নীরব থাকিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিল।"

* * *

গভীর রাত্রে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে নরেন্দ্রনাথ একাকী নির্জনে বসে প্রায়ই কঠোর ধ্যানে মগ্ন হতেন ; তাঁর এই উগ্র তপস্যা দর্শন ক'রে ঠাকুর তাঁকে স্বীয় জীবনের সাধনকালের অষ্টৈশ্বর্য্য দান করতে চাইলে, নরেন্দ্রনাথ প্রশ্ন তুলেছিলেন যে, তার দ্বারা ভগবান লাভ করা যায় কিনা। কিন্তু যখন ঠাকুরের কাছ থেকে শোনেন যে, ঐহিক বাসনা পূর্ণ হওয়া ছাড়া আর কিছু হবে না, তিনি তৎক্ষণাৎ ঠাকুরের ঐ প্রলোভনাত্মক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, আর ঠাকুর মনে মনে অপার আনন্দলাভ ক'রে ভেবেছিলেন, এইরকম ভক্ত-শিষ্য দ্বারাই তাঁর সার্বভৌম উদার ভাবধারা জগতে প্রচারিত হবে।

* * *

কাশীপুরে থাকাকালীন ঠাকুরকে না জানিয়ে একদা নরেন্দ্রনাথ (স্বামীজী), তারকনাথ (স্বামী শিবানন্দ) এবং কালী (স্বামী অভেদানন্দ) বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধদেবের

তপস্যার স্থান দর্শন করতে গিয়েছিলেন। সেখানে এক ধর্মশালায় সহসা নরেন্দ্রনাথ পেটের যন্ত্রণায় অসুস্থ হয়ে পড়ায়, তাঁদের মনে হয় যে, ঠাকুরকে না জানিয়ে আসার দরুন তাঁদের এই বিপদ ঘটেছে। এই সম্পর্কে স্বামী অভেদানন্দ তাঁর 'আমার জীবনকথা' গ্রন্থে লিখেছেন—"আমরা বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। তখন কাতর হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি নরেন্দ্রনাথ একটু সুস্থ বোধ করিল। তখন শ্রীশ্রীঠাকুরকে কিছু বলিয়া আসা হয় নাই, তাঁহার অসুখের সময়ে আমরা তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছি এবং তাঁহার অনুমতি না লইয়া আসা অন্যায় হইয়াছে—এই সকল কথাই ক্রমাগত মনে আসিতে লাগিল। ক্রমশঃই আমাদের মন অস্থির হইয়া উঠিল। যেন এক আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলাম! নরেন্দ্রনাথের পেটের অসুখ তখনও সম্পূর্ণ সারে নাই, অথচ কাহারও নিকট কোনরূপ সাহায্য পাইবার উপায় নাই। দেখিলাম রেলভাড়াও সঙ্গে নাই। কাজেই আমরা বিষম বিভ্রাটে পড়িলাম, কিছু স্থির করিতে পারিলাম না। সুতরাং শীঘ্র কাশীপুরে ফিরিয়া যাওয়া কর্তব্য মনে করিলাম। কিন্তু ফিরিয়া যাইবার কোন পাথেয় তো আমাদের কাছে ছিল না।" অবশ্য এরপর ঠাকুরের অশেষ কৃপায় তাঁদের সবই জোগাড় হয় এবং তাঁরা নির্বিঘ্নে বুদ্ধগয়া থেকে ফিরে আসেন। পরবর্তী অধ্যায়ে স্বামী অভেদানন্দ লিখেছেন—"পরদিন প্রাতে রেলে চড়িয়া আমরা কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলাম এবং পরদিন সন্ধ্যার সময় কাশীপুরের বাগানে উপস্থিত হইলাম। এইদিকে শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের জন্য বিশেষ চিন্তিত ছিলেন এবং ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া মহানন্দে সাগ্রহে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিলেন। আমরা বুদ্ধগয়ার সমস্ত ঘটনাই আনুপূর্বিক তাঁহাকে নিবেদন করিলাম। সকল ঘটনা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং প্রশান্তভাবে বলিলেন—বেশ করেছিস।"

* * *

কাশীপুরে থাকাকালীন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের গলরোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং ঐ ভীষণ ব্যাধির সংক্রমণের ভয়ে সেবকদের মধ্যে কেউ কেউ একটু ভীত ও সঙ্কুচিত হয়ে পড়েন, কারণ, তাঁরাই ঠাকুরের গলরোগের প্রক্ষিপ্ত পুঁজ-রক্ত স্বহস্তে পরিষ্কারের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ তাঁদের মনোভাব বুঝতে পেরে নিজেই একদিন সেই প্রক্ষিপ্ত পুঁজ-রক্তের কিয়দংশ সকলের সম্মুখে মুখামৃতজ্ঞানে নিঃশেষে পান ক'রে, গুরুকে ঈশ্বরজ্ঞানে বিশ্বাসের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তাঁর দেখাদেখি অতঃপর নিরঞ্জন, শশী ও শরৎ বিনাদ্বিধায় তার অবশিষ্টাংশ পান ক'রেছিলেন।

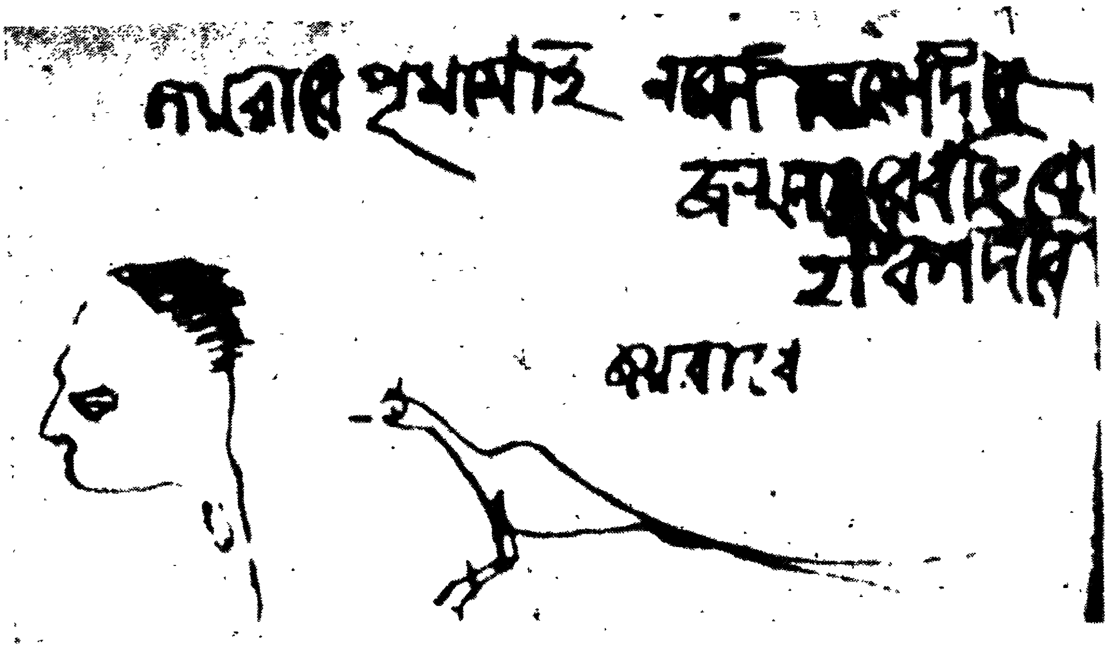
ঠাকুর তাঁর জীবনে শেষ গান শুনেছিলেন নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে এই কাশীপুর উদ্যানবাটীতে। উভয়ের মিলনের প্রথম লগ্নে যেমন গান দিয়ে স্বামীজীর, তথা নরেন্দ্রনাথের গুরুবরণ, ঠাকুরের লীলাবসানের সময় অবধি সেই গান দিয়েই বিরহ-লগ্নের উদ্বোধন—এ এক বিস্ময়কর ঘটনা! যেখানেই ঠাকুর আর স্বামীজী, সেখানেই গান, সেখানেই প্রাণ! গান-ই-তো প্রাণ, আবার প্রাণ-ই-যে গান! ঠাকুরের জীবদ্দশায় তাঁকে গানের পর গান শুনিয়েও আশা মেটেনি স্বামীজীর; তাই মহাপ্রয়াণের কদিন আগেও কাশীপুরে অসুস্থ ঠাকুরের সান্নিধ্যে চলেছে গানের মহড়া—আসন্ন শোককে গান দিয়ে জয় করার প্রচেষ্টা। স্বামীজীর মধ্যমভ্রাতা তপস্বী মহেন্দ্রনাথ দত্ত, তাঁর 'শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী (১ম খণ্ড)'-গ্রন্থে একটি ঘটনার উল্লেখ ক'রে লিখেছেন—"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পীড়া ক্রমেই বাড়িতে লাগিল এবং আরোগ্যের কোন আশা রহিল না। নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি রাত্রে উদ্দাম কীর্তন শুরু করিলেন। চীৎকার ধ্বনিতে বাড়ি কাঁপিতে লাগিল।······শ্রীরামকৃষ্ণ কীর্তনের দলের ভিতর থেকে একজনকে ডাকলেন এবং ব্যঙ্গচ্ছলে বলিলেন, 'তোরা তো বেশ রে; কেউ মরে, কেউ হরিবোল বলে।' উপস্থিত লোকটি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইল। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ পরক্ষণেই অতি আহ্লাদ করিয়া বলিলেন, 'ওর সুরটা এইরকম, অমুখ জায়গায় এক কলি তোরা ভুলেছিলি। ঐখানে ঐ কলিটা দিতে হয়।'······কীর্তনের আনন্দে সকলে বিভোর হইয়া অনেক রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। মহাশোকের ভিতরেও মনটাকে কিরূপে বৈরাগ্যভাব দিয়া ভগবানে লইয়া যাওয়া যায়, ইহা তাহার দৃষ্টান্ত।" এইভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলায় স্বামীজীর গান শেষ শুনেছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।

ঠাকুরের নিজের গাওয়া শেষ গানের ঘটনার কথাও জানা যায় এই কাশীপুর উদ্যানবাটীতে। লীলাসম্বরণের মাত্র কয়েকদিন আগে তিনি শ্রীশ্রীমা সারদা-দেবীকে নানাপ্রকার উপদেশ দানের সময়, তাঁর দেহত্যাগের পর শ্রীশ্রীমায়ের ওপর গুরুদায়িত্বের ভার অর্পণ করা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে যে গানটি গেয়ে শুনিয়েছিলেন তাঁর ব্যাধিযুক্ত কণ্ঠে, সেইটাই ঠাকুরের গাওয়া শেষ গান। সেই গানটি—

'এসে পড়েছি যে দায়, সে দায় বলবো কায়।
যার দায় সে আপনি জানে, পর কি জানে পরের দায়'॥

* * *

আর একটি ঘটনায় কাশীপুরে ইতিপূর্বে ঠাকুরের জন্মদিনে নরেন্দ্রনাথের তথা স্বামীজীর গানের প্রসঙ্গ পাওয়া যায় 'শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা'-গ্রন্থে। যথা:—



ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আঁকা ছবি ও হাতের লেখা

"কাশীপুরে ঠাকুরের জন্মোৎসব খুব সংক্ষেপে সারা হয়েছিল। সেদিন নোরেন ভায়ের গান হোলো আর সুরেন্দরবাবু একছড়া ভালো গোড়েমালা ঠাকুরের গলায় পরিয়ে দিলেন। বলরামবাবু ও মাষ্টারমশায় একখানা কাপড় ও আংগা দিলেন, আর একজোড়া চটি জুতো কে এনেছিলো জানি না। সেটা আবার চুরি যায়। তখন যে জুতা-জোড়া আনা হয়েছিলো, তা এখনও মঠে পুজো হয়।"

* * *

কাশীপুর পর্বে নরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে এরূপ বহু ঘটনার উল্লেখ আছে। আর মাত্র তিনটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ ক'রে এখানে আপাততঃ নরেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ শেষ করব।

'কল্পতরু' ঘটনার পর, একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল কাশীপুরে ১৮৮৬ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী শনিবার সন্ধ্যায়। এটিও ঠাকুরের অন্তর্লীলায় একটি বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে আছে, যা অনেক ভক্তদের কাছেই অজ্ঞাত, অথচ এটি শ্রীরামকৃষ্ণ-অন্তর্লীলার একটি নিগূঢ় তত্ত্ব বহন করছে। 'কথামৃত'-গ্রন্থের ৫ম খণ্ডের পরিশিষ্টে উল্লেখ আছে—"কাশীপুরে যখন শ্রীরামকৃষ্ণ পীড়িত হইয়া আছেন (১৮৮৬ খৃঃ অঃ) একদিন একটি কাগজে লিখিয়াছিলেন—'নরেন্দ্র শিক্ষে দিবে'।" এই ঘটনার পটভূমিকায় এবার প্রবেশ করা যাক্।

সেদিন গলরোগের চরম যন্ত্রণায় ঠাকুরের কণ্ঠ রুদ্ধ—গলার ক্ষত দিয়ে অবিরত পুঁজ-রক্ত নিষ্ক্রমণ হচ্ছে—গলায় গাঁদাপাতার পুল্‌টিস্ দিয়ে সেই যন্ত্রণা লাঘবের চেষ্টা চলছে। সেদিন ঠাকুর কোন অন্তিম ইচ্ছা প্রকাশ করতে চান—কিন্তু কথা বলার শক্তি নেই। সেদিন সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে সাতটায় ঠাকুর অনেক ভক্তকে কাছে ডেকে একটুকরো কাগজ চেয়ে নেন। গলায় নিদারুণ ব্যথার দরুন কথা একেবারে বন্ধ হওয়ায়, মনের কথাটি সেই কাগজে লেখেন। কাগজটিতে কয়েকটিমাত্র মোটা অক্ষর লিখে তাঁর শেষ ইচ্ছার কথা সেখানে লিখেছেন এবং কাগজের নীচে বাঁদিক ঘেঁসে দুটি ছবিও এঁকেছেন। লেখাটি এইরূপ—'জয় রাধে প্রেমময়ী। নরেন শিক্ষে দিবে, যখন ঘরে বাহিরে হাঁক দিবে, জয় রাধে।' এটি পরিষ্কারভাবে এখানে লেখা হ'ল; প্রকৃতপক্ষে তিনি স্বহস্তে লিখেছিলেন—'জয় রাঁধে পৃম মোহি নরেন সিক্ষে দিবে জখন ঘুরে বাহিরে হাঁক দিবে জয় রাধে।' এর সঙ্গে ঠাকুরের স্বহস্তে অঙ্কিত একটি তাৎপর্যপূর্ণ রেখাচিত্র—একটি মানুষের মুখ, কণ্ঠে ক্ষতচিহ্ন; তার পিছনে একটি ময়ূর পেখম গুটিয়ে অনুসরণ করছে। যেদিন যে সময়ে এই পরম তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাটি ঘটে, সে সময় কথামৃতকার মাষ্টারমশাই শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশেই গিয়েছিলেন কামারপুকুর দর্শনে। সেদিন রাত প্রায়

এগারটার সময় কাশীপুরের উদ্যানবাটীতে ফিরে প্রথমে দোতলার ঘরে ঠাকুরের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেন, কিন্তু ঠাকুর তাঁকে এই বিষয়ে কোন ইঙ্গিত দেননি। পরে একতলার ঘরে নেমে অন্যান্য ভক্তদের কাছে এই অপূর্ব বৈচিত্র্যময় লীলাকাহিনী শোনেন এবং ঠাকুরের হস্তাক্ষর ও অঙ্কিত ছবি দর্শন ক'রে বিস্মিত হন। তাঁর সেদিনের ডায়েরীর পাতায় এটি সযত্নে রক্ষা ক'রে মাষ্টারমশাই তাঁর মন্তব্যস্বরূপ লিখে রাখেন—'I take it without have as something too valuable to be lost' অর্থাৎ 'আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে এটিকে বিনষ্ট প্রাপ্তি থেকে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করি।' (স্বামী প্রভানন্দজী রচিত 'আনন্দরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রন্থ অবলম্বনে)

প্রকৃতপক্ষে, তত্ত্বের দিক দিয়ে সেদিন নিজের ছবিই এঁকেছিলেন ঠাকুর। ভীষণ ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে নিজের প্রতিকৃতিতে গলার কাছে ক্ষতচিহ্ন এঁকে সম্ভবতঃ বোঝাতে চেয়েছিলেন, এ 'ক্যান্সার' শুধু তাঁর কণ্ঠে নয়—সমস্ত মনুষ্য সমাজের কণ্ঠে এই 'ক্যান্সার' এবং তাঁর এই যন্ত্রণা প্রকৃতপক্ষে 'যুগযন্ত্রণা।' যুগের ছবিটি নিয়েই যুগাবতারের লীলা! সমাজের সকল স্তরেই আজ ক্যান্সার —সর্বত্রই যন্ত্রণা! তাই ঐ মুখ শুধু যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের নয়, বর্তমান যুগেরও মুখ। আর ঐ বিকৃত, রোগগ্রস্ত মুখের পিছনে আশার প্রতীকরূপে বিরাজমান এক ময়ূর। ময়ূর শুধু বাহারী পাখী নয়, প্রয়োজনে তার বাঁকা ঠোঁট দিয়ে সে বিষাক্ত সর্পকেও চিবিয়ে খায়। অঙ্কিত ছবিটি শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রনাথের প্রতীক ছবি। শ্রীরামকৃষ্ণের পিছনে নরেন্দ্রনাথ,—তাই ঠাকুর লিখে গেলেন—'নরেন শিক্ষে দিবে, যখন ঘরে বাহিরে হাঁক দিবে'। প্রথমে লিখেছেন—'জয় রাধে প্রেমময়ী,'—শেষে আবার লিখেছেন—'জয় রাধে'। লোকশিক্ষা দেবার লিখিত চাপরাশ ঠাকুর দিলেন নরেন্দ্রনাথকে—আগে রাধা নাম, পরেও রাধা নাম; অর্থাৎ কর্মযোগের আগে প্রেম, পরেও প্রেম। প্রেমের প্রতীক শ্রীরাধার জয়-ধ্বনির স্নিগ্ধ সুধাময় মঙ্গলকলস স্থাপন করলেন নরেন্দ্রনাথের শিরে। তাইতো জীবপ্রেমে মাতোয়ারা নরেন্দ্রনাথ খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর জাগতিক ঈশ্বরকে জনগণের মাঝে; দর্শন ক'রেছিলেন করুনামাখা প্রেমদৃষ্টিতে 'সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ'। এই প্রেমের শিক্ষাই শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা—শেষ শিক্ষা। এই শিক্ষারই বাস্তবরূপ দিলেন নরেন্দ্রনাথ ঐ চিরকুটে লেখা ভবিষ্যৎবাণী সফল ক'রে —'নরেন শিক্ষে দিবে, যখন ঘরে বাহিরে হাঁক দিবে'। ভবিষ্যতে কোন গবেষক যদি শুধুমাত্র এই একটি বিষয়ে গভীরভাবে আধ্যাত্মিক গবেষণায় রত হন, তবে যুগ-ধর্ম, যুগ-সঙ্কট এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের পরস্পর পরিপূরক

সত্তার অনেক নব নব তত্ত্বের সন্ধান লাভ করবেন ও অনেক বিভ্রান্তির অবসান ঘটবে।

* * *

দ্বিতীয় ঘটনা। ঠাকুরের মহাসমাধির আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকী। মৃত্যুর ছায়া নেমে আসছে ঠাকুরের শীর্ণ শরীরে। নরেন্দ্রনাথকে কাছে ডেকে জীবনের শেষ অমৃত বিন্দুটি নরেন্দ্রনাথের মধ্যে উৎসর্গ ক'রে ঠাকুর সেদিন ফকির হলেন। ঠাকুরের রোগজীর্ণ মলিন গণ্ডদেশ অশ্রুসিক্ত; নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ও বিষাদ-গ্রস্ত। বুঝতে তাঁর বিলম্ব হ'ল না—এইবার সত্যই ঠাকুর নশ্বর দেহ ত্যাগ ক'রে অমৃতলোকে যাবার জন্য প্রস্তুত! স্বামীজীর গৃহীশিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী রচিত 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' গ্রন্থে স্বামীজীর নিজ মুখেই ব্যক্ত হয়েছে সেই ঘটনা। যথা:—
"ঐ যে ঠাকুর যাকে 'কালী' 'কালী' ব'লে ডাকতেন, ঠাকুরের দেহ রাখবার দু-তিন দিন আগে সেইটে এই শরীরে ঢুকে গেছে; সেইটেই আমাকে এদিক ওদিক কাজ করিয়ে নিয়ে বেড়ায়, স্থির থাকতে দেয় না, নিজের সুখের দিক দেখতে দেয় না।······ঠাকুরের দেহ যাবার তিন-চারদিন আগে তিনি আমাকে একাকী একদিন কাছে ডাকলেন, আর সামনে বসিয়ে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। আমি তখন ঠিক অনুভব করতে লাগলুম তাঁর শরীর থেকে একটা electric shock (তড়িৎ-কম্পন)-এর মতো এসে আমার শরীরে ঢুকছে! ক্রমে আমিও বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলুম! কতক্ষণ এরূপভাবে ছিলুম, আমার কিছু মনে পড়ে না; যখন বাহ্যচেতনা হ'ল, দেখি ঠাকুর কাঁদছেন। জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর সস্নেহে বললেন, 'আজ যথাসর্বস্ব তোকে দিয়ে ফকির হলুম! তুই এই শক্তিতে জগতের অনেক কাজ ক'রে তবে ফিরে যাবি।' আমার বোধ হয়, ঐ শক্তিই আমাকে এ-কাজে সে-কাজে কেবল ঘুরোয়। ব'সে থাকবার জন্য আমার এ দেহ হয়নি।"

সেদিন এই ঘটনার তাৎপর্য বুঝতে পেরে গুরুগতপ্রাণ স্বামীজী শুধু বালকের মত অশ্রু বিসর্জন ক'রেছিলেন। মহাসমাধির আগে আর একদিন ঠাকুর তাঁকে ডেকে বলেছিলেন, 'দেখ নরেন, তোর হাতে এদের (অর্থাৎ ত্যাগী ভক্তদের) সকলকে দিয়ে যাচ্ছি, কারণ তুই সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী। এদের খুব ভালবেসে, যাতে আর ঘরে ফিরে না গিয়ে একস্থানে থেকে খুব সাধনভজনে মন দেয়, তার ব্যবস্থা করবি।' বলা বাহুল্য, গুরুপ্রদত্ত এই গুরুদায়িত্ব পরবর্তীকালে স্বামীজী ঠিক ঠিক পালন করেছিলেন।

* * *

তৃতীয় ঘটনাটি সংশয় নিরসনের ঘটনা। জীবন-মরণের নিদারুণ সংগ্রামের

মধ্যেই, ঠাকুরের অবতারত্বের সংশয়ের অগ্নিপরীক্ষায় নেমেছিলেন নরেন্দ্রনাথ। রোগশয্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ যখন সমাধিস্থ অবস্থায় শায়িত, তখন নরেন্দ্রনাথের স্বভাবসিদ্ধ বিচারশীল মনে সন্দেহের উদয় হয়—শ্রীরামকৃষ্ণ যে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান, একথার ইঙ্গিত তিনি বহুবার দিয়েছেন ; কিন্তু এখন এই রোগশয্যায় শায়িত ঠাকুরের অন্তিমকাল উপস্থিত ; এখন এই সময়ে যদি তিনি বলতে পারেন 'আমি ভগবান', তবে বিশ্বাস করব, ইনি সত্য সত্যই ভগবান। নরেন্দ্রনাথের বিচারশীল মনে এইভাবে সন্দেহ ও চিন্তার ধারা ওঠামাত্রই,—মরণপীড়নে অবনত গ্রীবা, অবসন্ন বাকশক্তিধারাকে প্রাণপণে উজ্জীবিত ক'রে, অন্তর্যামী ঠাকুর বিস্ফারিত নয়নে নরেন্দ্রনাথের দিকে দৃষ্টিপাত দ্বারা সব সংশয়ের অবসান ঘটিয়ে ঘোষণা করলেন, 'এখনও অবিশ্বাস ! যে রাম, যে কৃষ্ণ, সে-ই ইদানীং এই দেহে রামকৃষ্ণ, তবে তোর বেদান্তের বিচারে নয়'। নরেন্দ্রনাথের চক্ষে অশ্রুর বন্যা, ঠাকুরের মুখে ব্রহ্মানন্দ ! কাশীপুর পর্বে ঠাকুরের অন্তলীলায় এটি তাঁর অন্যতম 'হাটে হাঁড়ি ভাঙা'র ঘটনা। তবে, ঠাকুর যে নরেন্দ্রনাথকে 'বেদান্তের বিচারে নয়' বলেছিলেন, তার অর্থ—বেদান্তের জ্ঞান-মার্গের বিচারে অবতারের ইঙ্গিত নেই ; কেবল ভক্তিমার্গেই ভগবান ও ভক্তের কথা স্বীকৃত,—তাই ভক্তিপথেই অবতারত্ব বোঝা যায়।

* * *

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ঠাকুরের প্রধান পার্ষদ ও লীলাসহচর স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে ঠাকুরের লীলাবিলাসের কয়েকটিমাত্র কাহিনী এখানে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হ'ল। কারণ, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিরূপ স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর লীলার সামগ্রিক মূল্যায়ন করা কঠিন। তা ছাড়া, এই অন্তলীলায় ঠাকুরের অন্যান্য ত্যাগী সন্তানদের বহু কাহিনী জড়িত আছে, যেগুলির উল্লেখ করতে গেলে একটি বিশাল গ্রন্থ-রচনার প্রয়োজন হয়, যা এক্ষেত্রে সম্ভব নয়। তাই কেবলমাত্র ঠাকুরের একমাত্র লীলাসঙ্গিনী শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর একটু কথা ব'লে এই প্রসঙ্গ শেষ করব।

ঠাকুরের প্রধান লীলাসঙ্গিনী, সহধর্মিণী, সাক্ষাৎ জগজ্জননী, আদ্যাশক্তি-মহামায়া, ঠাকুরেরই উত্তরসাধিকা ও মহাশিষ্যা শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী তাঁর অন্তলীলার শুরু থেকেই সর্বত্র জড়িত—একথা বলা বাহুল্যমাত্র। তবে সকল ক্ষেত্রেই প্রকাশ্যে নয়, অনেক ক্ষেত্রে সকলের চক্ষুর অন্তরালে। জগজ্জননী হয়েও তিনি মনুষ্যদেহ-ধারিণী হওয়ায়, ঠাকুরের মতই মনুষ্যবৎ লীলা ক'রে গেছেন। তাই ঠাকুরের রোগ-যন্ত্রণায় তিনিও কাতর হতেন, আবার ঠাকুরের রোগ নিরাময়ের জন্য তাঁকে তারকেশ্বরে হত্যা দিতেও যেতে হয়েছিল ; এ-ও এক বিচিত্র লীলা !

ঠাকুরের নিদারুণ কষ্ট, অথচ চিকিৎসা সত্ত্বেও আরোগ্যের কোন লক্ষণ নেই

বুঝে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী দৈবশক্তির সাহায্যে ঠাকুরের নিরাময়ের জন্য একদা কাশীপুর থেকে তারকেশ্বরে যান। কিন্তু তাঁর তারকেশ্বরে যাওয়ার কথা শুনে ঠাকুর আঙুল নেড়ে তাঁকে জানিয়েছিলেন যে সেখানে গেলে কোন ফল হবে না, তবু শ্রীশ্রীমা তারকেশ্বরে গিয়ে হত্যা দিয়ে মন্দিরে প'ড়ে থাকেন। ভগবানকে রক্ষার জন্য দেবতার দুয়ারে নিষ্ফল ধর্না! মানুষ হয়ে ভগবান যখন অবতীর্ণ হন, তখন সব ব্যবস্থাই মানুষের নিয়ম অনুসারে পালিত হয়—আর ভগবান এই অভিনয়ের জন্য কত প্রকার চাতুরী অবলম্বন করেন, এটিও তার নিদর্শন। যাই-হোক, তারকেশ্বরে দ্বিতীয়রাত্রে প্রচণ্ড এক শব্দে শ্রীশ্রীমায়ের তন্দ্রাভঙ্গ হয় এবং এই পার্থিব সম্বন্ধ সম্পূর্ণ অলীক—এই জ্ঞানে তিনি তারকেশ্বর থেকে কাশীপুরে ফিরে আসেন। ঠাকুর কাশীপুরে শ্রীশ্রীমাকে বলেছিলেন, 'শুধু কি আমারই দায়? তোমারও দায়।' নিজে অপ্রকট হলে পাছে শ্রীশ্রীমাও ঠাকুকে অনুসরণ ক'রে দেহের মায়া ছিন্ন করেন, তাই ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, 'কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মতন কিলবিল কচ্চে, তুমি তাদের দেখবে।' 'আমি কী করেচি, তোমাকে এর চাইতে অনেক বেশী কত্তে হবে'।—ইত্যাদি নানা ভাবদ্যোতক কথার মধ্যেই ঠাকুরের অন্তলীলায় শ্রীশ্রীমায়ের প্রকৃত সত্তারও নির্দেশ ক'রে গেছেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। অবশেষে দেহরক্ষার কিছুদিন আগে ঠাকুর তাঁর বাহু থেকে সোনার ইস্টকবচখানিও অপসারিত ক'রে, শ্রীশ্রীমায়ের হাতে সেটি অর্পণ ক'রে সকল বিষয়ে মুক্ত হন এবং শ্রীশ্রীমাকেই প্রকৃতপক্ষে তাঁর উত্তরাধিকার দিয়ে যান।

* * *

এবার আমরা শ্রীরামকৃষ্ণলীলার সর্বশেষ অধ্যায়ে আসব। এ অধ্যায়টি ভক্তদের কাছে বড়ই করুণ, বড়ই হৃদয়বিদারক! এই প্রসঙ্গে কথামৃতকার মাষ্টারমশাই শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্তের নানা বিবরণের মধ্য থেকে একটিমাত্র বিবরণ উল্লেখ করলেই, তৎকালীন অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধির পক্ষে যথেষ্ট। যথা :—"ঠাকুর আজও বিশেষ অসুস্থ। রাত্রি দুই প্রহর। আজ শুক্লপক্ষের নবমী তিথি, চাঁদের আলোয় উদ্যানভূমি যেন আনন্দময় হইয়া রহিয়াছে। ঠাকুরের কঠিন পীড়া, চন্দ্রের বিমল কিরণদর্শনে ভক্তহৃদয়ে আনন্দ নাই। যেমন একটি নগরীর মধ্যে সকলই সুন্দর, কিন্তু শত্রুসৈন্য অবরোধ করিয়াছে। চতুর্দিক নিস্তব্ধ, কেবল বসন্তানিল স্পর্শে বৃক্ষপত্রের শব্দ হইতেছে। উপরের হলঘরে ঠাকুর শুইয়া আছেন। ভারী অসুস্থ,—নিদ্রা নাই। দু-একটি ভক্ত নিঃশব্দে কাছে বসিয়া আছেন—কখন কি প্রয়োজন হয়। এক একবার তন্দ্রা আসিতেছে ও ঠাকুরকে নিদ্রাগত-

প্রায় বোধ হইতেছে। এ কি নিদ্রা, না মহাযোগ? ...মাষ্টার কাছে বসিয়া আছেন। ঠাকুর ইঙ্গিত করিয়া আরো কাছে আসিতে বলিতেছেন। ঠাকুরের কষ্ট দেখিলে পাষাণ বিগলিত হয়। মাষ্টারকে আস্তে আস্তে অতি কষ্টে বলিতেছেন—'তোমরা কাঁদ্‌বে ব'লে এত ভোগ করছি—সব্বাই যদি বলো যে, এত কষ্ট তবে দেহ যাক্—তা হ'লে দেহ যায়।' কথা শুনিয়া ভক্তদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। যিনি তাঁহাদের পিতা মাতা রক্ষাকর্তা, তিনি এইকথা বলিতেছেন! সকলে চুপ করিয়া আছেন। কেহ ভাবিতেছেন, এরই নাম **crucifixion**! ভক্তের জন্য দেহ বিসর্জন।"

(কথামৃত—৩য় ভাগ, চতুর্বিংশতি খণ্ড—১ম পরিচ্ছেদ)

এই ঘটনার পরের দিন (১৫ই মার্চ ১৮৮৬) ঠাকুর নিজ উপলব্ধির কথা ভক্তদের কাছে বলেন,—"কি দেখছি জান? তিনি সব হয়েছেন! মানুষ আর যা জীব দেখছি, যেন চামড়ার সব তয়েরি—তার ভিতর থেকে তিনিই হাত পা মাথা নাড়ছেন! ...এখন আমার কোনও কষ্ট নাই, ঠিক পূর্বাবস্থা।"

(কথামৃত—৩য় ভাগ, চতুর্বিংশ খণ্ড—২য় পরিচ্ছেদ)

এরপর ঠাকুরের লীলাসংবরণের বিষয়ে উল্লেখযোগ্য আলোচনা; যথা:—"কিয়ৎপরে মাষ্টারকে বলিতেছেন, 'শরীরটা কিছুদিন থাকতো, লোকেদের চৈতন্য হ'তো'। ঠাকুর আবার চুপ করিয়া আছেন।

ঠাকুর আবার বলিতেছেন—'তা রাখবে না'। ভক্তেরা ভাবিতেছেন, ঠাকুর আবার কি বলিবেন। ঠাকুর আবার বলিতেছেন—'তা রাখবে না,—সরল মূর্খ দেখে পাছে লোকে সব ধ'রে পড়ে। সরল মূর্খ পাছে সব দিয়ে ফেলে! একে কলিতে ধ্যান জপ নাই।'

রাখাল (সস্নেহে)—'আপনি বলুন—যাতে আপনার দেহ থাকে'।

শ্রীরামকৃষ্ণ—'সে ঈশ্বরের ইচ্ছা।'

নরেন্দ্র—'আপনার ইচ্ছা আর ঈশ্বরের ইচ্ছা এক হয়ে গেছে।'

ঠাকুর চুপ করিয়া আছেন—যেন কি ভাবিতেছেন।"

(কথামৃত—৩য় ভাগ, চতুর্বিংশতি খণ্ড—২য় পরিচ্ছেদ)

এরপর ঠাকুরের অতিগুহ্য কথা:— যথা:—"ভক্তেরা নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন। ঠাকুর ভক্তদের সস্নেহে দেখিতেছেন, নিজের হৃদয়ে হাত রাখিলেন,—কি বলিবেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রাদিকে)—'এর ভিতর দুটি আছেন। একটি তিনি।' ভক্তেরা অপেক্ষা করিতেছেন আবার কি বলেন।

ও—'একটি তিনি, আর একটি ভক্ত হয়ে আছে। তারই হাত ভেঙ্গেছিল, তারই এই অসুখ করেছে। বুঝেছ?'

ভক্তেরা চুপ করিয়া বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—'কারেই-বা বলব, কেই-বা বুঝবে!'

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন—'তিনি মানুষ হ'য়ে—অবতার হ'য়ে—ভক্তদের সঙ্গে আসেন। ভক্তেরা তাঁরই সঙ্গে আবার চ'লে যায়।'

রাখাল—'তাই আমাদের আপনি যেন ফেলে না যান।'

ঠাকুর মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। বলিতেছেন—'বাউলের দল হঠাৎ এলো,—নাচলে, গান গাইলে; আবার হঠাৎ চ'লে গেল! এলো—গেল, কেউ চিনলে না।' ……কিয়ৎক্ষণ আবার চুপ করিয়া, ঠাকুর আবার বলিতেছেন—'দেহ ধারণ করলে কষ্ট আছেই'।……'আর যে দেহ ধারণ করা,—এটি ভক্তদের জন্য'।"

(কথামৃত—৩য় ভাগ, চতুর্বিংশতি খণ্ড—৩য় পরিচ্ছেদ)

ঠাকুরের উপরোক্ত গুহ্যকথা প্রকাশের পর, তাঁর দেহধারণ, লীলা, রোগগ্রহণ, লীলাবসান প্রভৃতি সম্পর্কে সকল কিছুই পরিষ্কাররূপে উদ্ভাসিত হয়,—এজন্য পৃথক আর কোন তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। তবুও এই বিষয়ে বিভিন্ন ভক্তদের মনের ভাব জানা প্রয়োজন; তাই, ঠাকুরের পার্ষদ স্বামী অদ্ভুতানন্দ, তথা লাটু মহারাজের কিছু কথা এখানে প্রকাশ ক'রে বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করব। যথা:—"জনৈক ভক্ত একদিন বলরাম-মন্দিরে লাটু মহারাজকে জিজ্ঞাস করেন—'মহারাজ! ঠাকুরের মত ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির, যিনি অনুক্ষণ সমাধিতে থাকিতেন, তাঁর এরূপ রোগভোগের কারণ কি?'

লাটু মহারাজ—হামি তার কি জানে? মাষ্টারমশায়কে বলতে শুনেছি যে, অশুদ্ধ লোকের দরশন-পরশনের জন্য তাঁর অসুখ হয়েছিল। গিরিশবাবু বলতেন, 'এ তাঁর লীলা,—মানুষের দুঃখহরণ করবার ছল করেছেন'। রামবাবু বলতেন, এমন অসুখ না হ'লে ঠাকুরকে চিনতো কে? সুস্থ শরীরে সবাইতো ভগবানে মন রাখতে পারে। বাকী অসুস্থ শরীরে যিনি অনুক্ষণ নির্বিকল্পে থাকতে পারেন, তিনিই অবতার।' লোরেনভাই বলতো—'ওরে! আমাদের সেবা নেবেন, তাই তিনি এমন অসুখ করেছেন। ভাবছিস কেন? তাঁর অসুখ না হলে আমাদের কি সেবা করবার এমন সুযোগ হোতো? ওরে! এমন সুযোগ ছাড়িসনি। সবাই মিলে এমন সেবা লাগিয়ে দে, যাতে তিনি আমাদের ছেড়ে কোথাও যেতে না পারেন।' রাখালভাই বলতো—'তিনি তো আমাদের বিড়ে নিচ্ছেন।' শরোট্-

ভাই বলতো—'আমরা বুঝি আর না বুঝি, এরই মধ্য দিয়ে একটি মহান উদ্দেশ্য সফল হোচ্ছে।' শশীভাই বলতো—'জগতের দুঃখু দেখে যীশু ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, ঠাকুরও জীবের দুঃখে রোগ ভোগ করছেন।' আর কেদারবাবুতো হাত জোড় ক'রে ঠাকুরের সামনে বলতেন—'প্রভু! আর কত ছলনা করবেন!' বলরামবাবু বলতেন—'আর যে শুনতে পারিনি, দয়াময়। তোদের ঠাকুরের অসুখ করেছে শুনতে শুনতে যে কান ঝালাপালা হয়ে গেল।' ঠাকুর তাতে বলেছিলেন—'ওগো! যে সয় সেই রয়, যে সয় সেই মহাশয়।' নানালোকে নানাকথা বলতো। সব হামার মনে নেই।

ভক্ত—আপনার কি মনে হয় মহারাজ?

লাটু মহারাজ—আরে! মনুষ্যদেহে জন্ম নিলেই শরীর ছাড়তে হয়, এ তো জানা কথা। তিনিও তাই ক'রেছেন।

ভক্ত—তিনি তো সমাধিতে লীন হতে পারতেন—চৈতন্য মহাপ্রভুর মত?

লাটু মহারাজ—তা' পারতেন! বাকী তাতে তাঁর ভক্তদের কষ্ট হোতো। ভগবান ভক্তদের মনে দুঃখু দেন না, জানো তো?

ভক্ত—আপনাদের মনে রোগের কষ্ট দেখে দুঃখ হোতো না, মহারাজ?

লাটু মহারাজ—তাঁর কি কষ্ট ছিলো? তিনি তো বলতেন—'দেহ জানে আর রোগ জানে, মন তুমি আনন্দে থাক।' তাঁর কষ্ট কুছু ছিল না। এক এক সময় তাঁর এমন অবস্থা হোতো যে, সারা দেহে পুলক ঝ'রে পড়তো। হামনে তো দেখেছে যে, তিনি তখন কেমন আনন্দে থাকতেন। যখন কথা বলতে পারতেন না, তখনও দেখেছে যে, তিনি ইঙ্গিতে বোঝাতেন, এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার হোতো যে কী বলব! বাহিরের লোক এসে বলতো তাঁর কত কষ্টই না হচ্ছে, আর সেই সময় হামাদের কেউ ঘরে ঢুকলে বুঝাতেন, তাঁর কোন কুছু কষ্ট নেই। সত্যি যদি তাঁর দুঃখু কষ্ট হতো, তা হলে কি তিনি হামাদের এতো আনন্দ দিতে পারতেন?"

(শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা—চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়)

*　　　*　　　*

কিন্তু সেই সদানন্দময় শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের নিরানন্দ সাগরে ভাসিয়ে এবার সত্যই স্বস্থানে ফিরে যেতে আগ্রহী; তাই এবার খেলা ভাঙার খেলা; চরম দুঃখের দিন আসন্ন! এই সময়কার ঘটনাগুলি বিভিন্ন প্রামাণিক গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ ক'রে এবং ধারাবাহিকতা বজায় রেখে পর পর সাজিয়ে দেওয়া হ'ল।

মহাপ্রস্থানের প্রায় এক সপ্তাহ পূর্বে একদিন ঠাকুর তাঁর অন্যতম পার্ষদ

যোগীনকে, তথা স্বামী যোগানন্দকে একখানি বাংলা পঞ্জিকা আনতে বলেন এবং ২৫শে শ্রাবণ (৯ই আগষ্ট) থেকে বার, তিথি পড়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ করেন, কিন্তু ঐ মাসের শেষ তারিখ, অর্থাৎ ৩১শে শ্রাবণ (১৫ই আগষ্ট) অবধি পড়া হলেই তিনি ঈশারায় তাঁকে পঞ্জিকা বন্ধ করতে বলেন; কিন্তু ভক্তেরা কেউই তখন ঠাকুরের এই পঞ্জিকা দেখার উদ্দেশ্য বোধগম্য করতে সক্ষম হননি। এই ঘটনার ৪।৫ দিন বাদেই ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে সবস্ব দিয়ে ফকির হ'য়েছিলেন, যে কাহিনী ইতিপূর্বেই বিবৃত হয়েছে।

ঠাকুরের মহাপ্রস্থানের পূর্বদিন দুপুরবেলা বিনামেঘে একটা বাজ পড়ার মত শব্দ হয়। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মীদিদি সেই প্রচণ্ড শব্দ শুনে ঠাকুরের ঘরে এসে ঠাকুরের খোঁজ খবর নেন, কিন্তু সেই আওয়াজের কোন হদিশ পাননি।

পরের দিন—১৮৮৬ সালের ১৫ই আগষ্ট, রবিবার, ১২৯৩ বঙ্গাব্দের ৩১শে শ্রাবণ, সংক্রান্তি, পূর্ণিমা। এইদিন মধ্যরাত্রে ঠাকুরের মহাসমাধি হয়।

এই দিন সকাল থেকেই ঠাকুরের ব্যাধি সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায় এবং তিনি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে থাকেন। ঠাকুরকে বালিশে ঠেস দিয়ে বসিয়ে রাখা হয় যন্ত্রণা লাঘবের জন্য। শ্রীশ্রীমা ও শ্রীমতী লক্ষ্মীদিদি একবার কাছে যেতেই ঠাকুর আস্তে আস্তে তাঁদের বলেন,—'এসেচ? দেখ, আমি যেন কোথায় যাচ্চি—জলের ভিতর দিয়ে—অ-নেক দূর!' এই কথায় শ্রীশ্রীমা কাঁদতে থাকায় ঠাকুর আবার বলেন—'তোমার ভাবনা কী? যেমন ছিলে, তেমনি থাকবে। আর এরা আমায় যেমন করেচে, তোমায়ও তেমনি করবে। লক্ষ্মীটিকে দেখো, কাছে রেখো।'

এইদিনই আবার শ্রীশ্রীমা যখন খিচুড়ি রান্না করছিলেন, তখন খিচুড়ি ধ'রে যায় এবং তলার অংশ পুড়ে যায়। কিন্তু শ্রীশ্রীমা বাধ্য হয়ে সেই খিচুড়িই ঠাকুরের সন্তানদের আহার করতে দেন। আবার সেইদিনই শ্রীশ্রীমায়ের যে শাড়ীখানি ছাদে শুখাতে দেওয়া হয়েছিল, সেটি চুরি যায়, অথবা হারিয়ে যায়। এই সব অশুভ লক্ষণাদি সকাল থেকেই উপস্থিত হয় এবং সকলেই ঠাকুর সম্পর্কে আতঙ্কিত থাকেন। বিকালে ঠাকুরের কষ্ট আরো বৃদ্ধি পাওয়ায়, চিকিৎসক নবীন পাল ঠাকুরকে পরীক্ষা করতে আসেন, কিন্তু রোগটি যে দুঃসাধ্য সে-কথা ঠাকুরকে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেওয়ায় ঠাকুর আক্ষেপ ক'রে বলেন, 'এরা এতদিন পরে বলে কি? যদি রোগই না সারে, তবে বৃথা কেন এই যন্ত্রণা?' ঠাকুর যে এবার সত্যই বিদায়ের জন্য প্রস্তুত, এই কথাতেই তার প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

অতঃপর ভক্ত গিরিশচন্দ্রের ভ্রাতা অতুলকৃষ্ণ, যিনি নাড়ী পরীক্ষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, ঠাকুরের নাড়ী পরীক্ষা ক'রে তাঁর সঙ্কটজনক অবস্থা বুঝে সকল ভক্তকে প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ করেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঠাকুরের শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হ'লে ভক্তেরা কাঁদতে থাকেন এবং তাঁর শয্যার চারপাশে সমবেত হন। সন্ধ্যার সময় ঠাকুরের কিছু ক্ষুধার উদ্রেক হওয়ায়, তাঁকে কিছু তরল পথ্য দিলে, তিনি তার সামান্যই গলাধঃকরণ করেন। পরে ভক্তগণ তাঁর হাতমুখ পরিষ্কার করিয়ে তাঁকে শয্যায় শয়ন করান। শোয়ার পূর্বে যেমন রোজ ঠাকুর বলতেন—'হরি ওঁ তৎ সৎ' —সেদিনও তিনি সেই কথা বলেছিলেন এবং শায়িত ঠাকুরকে লাটু মহারাজ পাখার বাতাস করছিলেন। রাত্রি প্রায় এগারটার সময় ঠাকুর একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাধিস্থ হন; তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাষ্ঠবৎ নিশ্চল ও কঠিন আকার ধারণ করায়, এই অসাধারণত্ব দৃষ্টে ভক্ত শশী (পরবর্তীকালে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) ক্রন্দন করতে থাকেন। নরেন্দনাথ সেই-সময় ভক্তদের সকলকে 'হরি ওঁ তৎ সৎ'—নামকীর্তন করতে বলায়, অনেকক্ষণ নামকীর্তনের পর ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হয় এবং তিনি কিছু আহার করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এবার ঠাকুরকে সহসা সুস্থ দেখে, তাঁকে বালিশে ঠেসান দিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয় এবং ভক্ত শশী তাঁকে একবাটি সুজির পায়েস খাইয়ে দেন। ঠাকুর বিনা ক্লেশেই সুজির পায়েস খাওয়ায় এবং নিজমুখে তাঁর স্বচ্ছন্দভাবের কথা প্রকাশ করায়, নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিদ্রা যেতে অনুরোধ করেন। ঠাকুরও স্পষ্টভাবে তিনবার 'কালী' নাম উচ্চারণের পর ধীরে ধীরে শয্যায় শয়ন করলে, ঠাকুরকে সুস্থ দেখে নরেন্দ্রনাথও নীচে চ'লে আসেন, কিন্তু সকল ভক্তই উদগ্রীব হয়ে ঠাকুরের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি'-গ্রন্থে এই দিনের বর্ণনায় আছে :—

"নরেন্দ্র শ্রীপ্রভুদেবে কহেন তখন।
নিদ্রায় আরাম চেষ্টা উচিত এখন॥
এত শুনি গুণমণি লীলার ঈশ্বর।
বহুকালাবধি কণ্ঠে ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বর॥
আজি পূর্ণ কণ্ঠে নাহি বিয়াধি যেমন।
তিনবার কালী কালী কৈলা উচ্চারণ॥
মা-কালী জীবন তাঁর ডাকিয়া তাঁহারে।
ধীরে ধীরে শুইলেন শয্যার উপরে॥
প্রভুকে সুস্থির দেখি নরেন্দ্র তখন।
বিশ্রামের হেতু নীচে করেন গমন॥

ইতিমধ্যে কি হইল শুন অতঃপর।
কণ্টকিত চকিতে প্রভুর কলেবর ॥
নাসিকার অগ্রভাগে আঁখিদৃষ্টি স্থির।
সুশোভন হাস্যানন সমাধি গভীর ॥
এই সমাধিতে হৈল সমাধি মহান।
লীলাধামে ফিরে না আইলা ভগবান ॥"

*   *   *

সেই কালরাত্রি! ১৮৮৬ সালের ১৫ই আগষ্টের মধ্যরাত্রি—ইংরাজী মতে ১৬ই আগষ্ট, ১২৯৩ বঙ্গাব্দের ৩১শে শ্রাবণ, রাত্রি ১ টা ৬ মিনিটে সহসা বিদ্যুৎ প্রবাহের মত ঠাকুরের সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। চক্ষুস্থির—নাসিকার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ—পুলকিত শরীরে কেশগুলিও কণ্টকিত—দিব্যদেহ হ'তে জ্যোতি বিকশিত—তাতেই যেন গৃহটি পূর্ণ। মুখমণ্ডলে প্রশান্তি ও আনন্দের ভাব। ভক্তগণের বুঝতে আর বাকী রইলে না—ঠাকুর মর্তধাম পরিত্যাগ ক'রে অমৃতধামে, অনন্তলোকে যাত্রা ক'রেছেন। সেই পূর্ণিমার রাত্রে এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই অকস্মাৎ এক নৈসর্গিক ঘটনায় আকাশে নানা পরিবর্তন এবং রক্ত, পীত ও নীলবর্ণের চন্দ্রমণ্ডলও দেখা গেল।

নরেন্দ্রনাথের মনে কিন্তু তখনো সন্দেহ! তিনি সেইরাত্রেই কাশীপুর থেকে লাটু মহারাজ ও বুড়োগোপাল মহারাজকে দক্ষিণেশ্বরে পাঠালেন ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালকে খবর দিয়ে আনতে। রামলাল সেইরাত্রেই তৎক্ষণাৎ কাশীপুরে চলে আসেন এবং ঠাকুরের দেহ পরীক্ষা ক'রে বলেন—'এখনো ব্রহ্মতালু গরম আছে। তোমরা একবার কাপ্তেনকে (শ্রীবিশ্বনাথ উপাধ্যায়কে) খবর দাও।' সেইমত কাপ্তেনকে খবর পাঠানো হ'ল এবং কলকাতার অন্যান্য ভক্তদেরও যথাসম্ভব খবর দেওয়া হ'ল।

অবশেষে কালরাত্রির অবসান! পরদিন ১লা ভাদ্র। দুঃসংবাদ প্রচার হতে বেশী সময় লাগে না। প্রত্যুষেই ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার সর্বপ্রথম কাশীপুর উদ্যানবাটীতে এসে ঠাকুরকে পরীক্ষা করেন এবং তাঁর মহাবায়ুর উৎক্রমণ হয়েছে ব'লে মন্তব্য করেন। কিন্তু ঠাকুরের পরমভক্ত, কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায় এসে লক্ষ্য করেন যে, যদিও ঠাকুরের সর্বশরীর কণ্টকিত ও কঠিন হয়েছে এবং চক্ষুদ্বয়ও স্থির হয়ে গেছে, তবু তখনও পর্যন্ত তাঁর মেরুদণ্ড উষ্ণ আছে। তিনি এই অবস্থাকে দেহ ত্যাগ ব'লে স্বীকার না ক'রে, 'সমাধিস্থ অবস্থা' ঘোষণা করেন এবং যোগশাস্ত্র অনুযায়ী ক্রিয়াকলাপের দ্বারা ঠাকুরকে সেই সমাধি অবস্থা থেকে স্বাভা-

বিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য বিশেষ আগ্রহী হন। ইতিমধ্যে ঠাকুরের বহু ভক্ত এসে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে উপস্থিত হন। যে কেউ এই মর্মান্তিক সংবাদ শুনেছেন, তৎক্ষণাৎ তিনি উদ্যানবাটীতে এসে উপস্থিত হয়েছেন। উদ্যানবাটী তখন লোকে লোকারণ্য! কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায় তখন পূর্ব নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যোগশাস্ত্রমতে ঠাকুরের দেহে গব্যঘৃত মালিশ করার জন্য উপদেশ দেন। কারণ, যোগশাস্ত্রে বিধি আছে যে, সমাধিস্থ যোগীর গ্রীবা, বক্ষ ও পাদমূলে যদি ব্রাহ্মণ দ্বারা গব্যঘৃত মালিশ করানো যায়, তা হলে সমাধিভঙ্গের সম্ভাবনা থাকে। কাপ্তেনের নির্দেশ অনুযায়ী ঠাকুরের তিনজন ব্রাহ্মণশিষ্য—শশিভূষণ চক্রবর্তী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ), শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী (স্বামী সারদানন্দ) এবং বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল যথাক্রমে ঠাকুরের গ্রীবায়, বক্ষে ও পাদমূলে ঘৃত মালিশ করতে থাকেন। কিন্তু তিন ঘণ্টারও অধিক সময় মালিশ করার পরও ঠাকুরের মহাসমাধি ভঙ্গ না হওয়ায়, তাঁরা সকল আশা ত্যাগ করেন। ইতিমধ্যে সেখানে সেই ভক্তদের ভীড়ের মাঝে সহসা কয়েকজন অপরিচিত সন্ন্যাসীও এসে উপস্থিত হন এবং ঠাকুরের মহাসমাধির কথা ঘোষণা করেন।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর মন আগে থেকেই এই বিপদাশঙ্কায় পীড়িত ছিল। সারারাত দারুণ উৎকণ্ঠায় থাকার পর এবার যখন বুঝলেন ঠাকুরের এটি মহাসমাধি, তখন প্রাণের আবেগে সর্বসমক্ষে চীৎকার ক'রে ওঠেন—'মা কালীগো, তুমি কী দোষে আমায় ছেড়ে গেলে গো!' সঙ্গে সঙ্গে উচ্চরোলে ক্রন্দন ও বিলাপে তিনি ভূপতিত হওয়ায়, লক্ষ্মীদিদি, গোলাপ-মা, বাবুরাম (স্বামী প্রেমানন্দ) আর যোগীন (স্বামী যোগানন্দ) শ্রীশ্রীমাকে ধ'রে তাঁর ঘরে নিয়ে যান ও তাঁর পরিচর্য্যায় রত হন। শ্রীশ্রীমা একবার কেঁদে সেই যে চুপ ক'রে গিয়েছিলেন, আর তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা যায়নি। এই সম্পর্কে স্বামী অভেদানন্দ তাঁর 'আমার জীবন-কথা'-গ্রন্থে বলেছেন—"প্রাতঃকালে মাতাঠাকুরানীকে সংবাদ দেওয়া হইল। শ্রীমা উপরে আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের পার্শ্বে বসিয়া 'মা কোথায় গেলি গো' বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সেই দৃশ্য হৃদয়বিদারক, কিন্তু অপরূপ বোধ হইতে লাগিল। আমরা একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আশ্চর্য পতি-পত্নীর সেই মধুর সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম এবং ভাবিলাম এইরূপ দৃশ্য ও ভাব আমরা পূর্বে কখনও দেখি নাই! প্রকৃতপক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমাকে শ্রীশ্রীভবতারিণীর জীবন্ত মূর্তি বলিয়া জ্ঞান করিতেন এবং শ্রীমাও শ্রীশ্রীঠাকুরকে মা কালী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। অপূর্ব ও মধুর সেই সম্বন্ধ শ্রীশ্রীঠাকুরের ও শ্রীমার!"

আর ঠাকুরের ভক্ত সন্তানেরা? তাঁদের অন্তর-ব্যথা প্রকাশের ভাষা ঠিকমত

আজও আবিষ্কৃত হয়নি! তবুও শোকাহত গৃহীভক্ত রামচন্দ্র দত্তের ভাষার সাহায্যে সকলের মনোব্যথার আংশিক প্রকাশ এইরূপ :—"এ যে বজ্রাঘাত, বজ্রাঘাত অপেক্ষাও কঠিন। বজ্রাঘাতে প্রাণ যায়, তাহাতে যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না; ইহার আঘাত বজ্রের ন্যায়, কিন্তু প্রাণ বহির্গত না হওয়ায় যন্ত্রণার বিরাম হয় না। যেমন তাঁহার সহিত নিত্য নব আনন্দ সম্ভোগ হইয়াছিল, এখন তেমনি নব নব বিরহ-জ্বালা সমুত্থিত হইয়া দেহ দাহ করিতে লাগিল। যখনই মনে হয় যে, তিনি আর নাই, আর তাঁহার আদরপূর্ণ অমিয়বৎ কথা শুনিতে পাইব না, নিকটে যাইলে আর তিনি তেমন করিয়া বসিতে বলিবেন না, বিষয়-সন্তাপে উত্তপ্ত হইয়া যাইলে আর তিনি শান্তিবারি প্রদান করিবেন না, আর তিনি আমাদের লইয়া সঙ্কীর্তনে মাতিবেন না, আর তাঁহার অপূর্ব নৃত্য দেখিতে পাইব না, আর তাঁহার বদন-বিনিঃসৃত হরিনাম ধ্বনি শুনিতে পাইব না,—তখনই হৃদয়নিহিত দারুণ বহ্নিজ্বালা আরও প্রবল প্রতাপে জ্বলিয়া উঠে! হায়! হায়! আমাদের কি হইল! কেন এমন সর্বনাশ হইল! আর কাহার কাছে যাইব, কোথায় গিয়া প্রাণ শীতল করিব? এই ঊনবিংশ শতাব্দীর হিল্লোলে পড়িয়া পথহারা হইয়া যাঁহার শ্রীচরণকৃপায় স্থির হইতে পারিয়াছিলাম, আজ তিনি কোথায়? আমাদের অকূলে ফেলিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন?"

(পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত—রামচন্দ্র দত্ত)

*　　　*　　　*

অবশেষে ভক্তগণ উদ্যানের পুষ্পরাজি দ্বারা ঠাকুরের দিব্যতনুর শেষ পূজা করেন এবং দিব্যগন্ধ ও পুষ্প দিয়ে শয্যাও সজ্জিত করেন। বৈকাল পাঁচ ঘটিকায় দ্বিতলের ঘর থেকে ঠাকুরের পূত দেহ নীচে গৃহের বহিরাঙ্গনে নামানো হয় এবং একখানি নতুন পালঙ্কের উপর সুকোমল শয্যায় শয়ন করানো হয়। আর্দ্রবস্ত্রে তাঁর অঙ্গ পরিষ্কারের পর, তাঁকে একখানি পীতাম্বর বস্ত্র পরিধান করিয়ে শ্বেতচন্দন দ্বারা সর্বশরীর ভূষিত করা হয়। গলদেশে পুষ্পমাল্য, মস্তকে পুষ্পচূড়া, কটিদেশে পুষ্পের বেড়া, চরণে পুষ্প নূপুরে তাঁকে মনোহর বেশে সজ্জিত করা হয়। এই সময় আকাশে সঞ্চরমান খণ্ডমেঘ থেকে বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা কিছুক্ষণের জন্য ঝরে পড়ে। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ঠাকুরের দিব্যতনুর শেষ আলোকচিত্র গ্রহণের জন্য ভক্তদের দশটি টাকা দিলে, তাঁরা 'বেঙ্গল-ফটোগ্রাফার' কোম্পানীকে খবর দিয়ে আনান এবং ভক্তপরিবৃত অবস্থায় ঠাকুরের মহাসমাধির শেষ দু'খানি ফটো তোলা হয়। পালঙ্কশায়িত ঠাকুরের দেহের সেই ছবি যখন তোলা হয়, তখন

অত্যধিক বিলম্বের জন্য প্রাতঃকালের সেই জ্যোতির্ময় ভাবটি অন্তর্হিত হলেও সহাস্য-বদন ছিল। (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন, ঠাকুরের দেহের শেষ স্মৃতিবাহী এই ফটোটি ভক্তসমাজে বিশেষ প্রচলিত নেই; কারণ, ঠাকুরের সৌম্য-মূর্তির ছায়াচিত্র দেখতে ও পূজা করতে অভ্যস্ত অধিকাংশ ভক্ত এই অসহ্য বেদনা-দায়ক চিত্রটি দর্শন ক'রে নিরানন্দ হতে চান না।

কাশীপুরের উদ্যানবাটিতে শেষদিনের ঘটনার একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা পাওয়া যায় তৎকালীন প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্তের একটি স্মৃতিচারণে। তিনি 'ফিনিক্স', 'ট্রিবিউন', 'লীডার,' 'প্রদীপ', 'প্রভাত' প্রভৃতি পত্রিকাগুলির সম্পাদক ও সাংবাদিকরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন এবং বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের আজীবন সভ্য ছিলেন। তাঁর স্মৃতিচারণ:—"কলকাতায় এসেছিলাম স্বল্পকালের জন্য। এক অপরাহ্ণে শুনলাম, পরমহংস রামকৃষ্ণ মহাসমাধি লাভ করেছেন। তৎক্ষণাৎ গাড়ী ক'রে কাশীপুর বাগানবাটীর উদ্দেশে যাত্রা করলাম। কলকাতার উত্তরাংশে কাশীপুরের বাগানবাটীতেই পরমহংসদেব তাঁর মর্ত্যজীবনের শেষ দিনগুলি কাটিয়েছিলেন। গিয়ে দেখলাম, বাড়ির গাড়ীবারান্দার সামনে ধবধবে সাদা এক শয্যায় তিনি শায়িত এবং বিবেকানন্দ ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ অশ্রুচোখে খাটটিকে ঘিরে মাটিতে ব'সে আছেন। পরমহংসদেব ডানপাশে ফিরে শুয়ে, তাঁর সারাদেহে নির্বাণের অনন্ত-নীরবতা ও শান্তি। শান্তি চারিদিকে—শান্তি মৌনবৃক্ষে, বিদায়ী অপরাহ্ণে, উপরের নীল আকাশে এবং তার উপরে নীরবে সঞ্চরমান খণ্ড মেঘে। মহামরণের সামনে সম্ভ্রমে শ্রদ্ধায় স্তব্ধ হয়ে যখন আমরা বসে রয়েছি, ঠিক তখনই কয়েকটি বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা ঝ'রে পড়ল। ঠিক যেন পুষ্পবৃষ্টি; আর্যসাহিত্যে যে-কথা আমরা পড়েছি, দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করেন,—যখন তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত কেউ পৃথিবী ত্যাগ ক'রে অমরলোকের উদ্দেশে যাত্রা করেন;—এই বারিবিন্দু সেই বিগলিত পুষ্পপর্ণ। রামকৃষ্ণ পরমহংসকে জীবিতকালে দর্শন করা জীবনের পরম সৌভাগ্য; একই সৌভাগ্য মৃত্যুর অঙ্কে তাঁর শান্ত মুখচ্ছবির দর্শনলাভ।" (শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস সম্পাদিত—'শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস (সমসাময়িক দৃষ্টিতে)'—গ্রন্থ অবলম্বনে)

অতঃপর সৎকারের সকল দ্রব্য সংগ্রহের পর বেলা আন্দাজ ছয়টার সময় কাশীপুর উদ্যানবাটী থেকে গৈরিক বসনে আচ্ছাদিত ঠাকুরের পূত দেহ নিয়ে ভক্তগণ কর্তৃক শবযাত্রা শুরু হয়। ঠাকুরের সুপরিচিত ভক্তগণ ছাড়াও, কলকাতা থেকে আগত ডাঃ গোপালচন্দ্র বসু, রাজমোহন বসু, কালিদাস সরকার, অমৃতলাল বসু, গিরিশচন্দ্র সেন, প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল প্রভৃতি ব্রাহ্মভক্তগণও

এই শবযাত্রায় যোগদান করেন। রাস্তার উভয়দিকে অগণিত ভক্ত নরনারী ঠাকুরকে শেষ দর্শন ক'রে অশ্রু বিসর্জন করতে থাকেন এবং সমবেত শিষ্য ও ভক্তবৃন্দ ঠাকুরের খাটটি বহন ক'রে হরিধ্বনি করতে করতে চলতে থাকেন। শবদেহের সম্মুখে একদল বৈষ্ণব খোল করতাল সহ হরিনাম সঙ্কীর্তন করতে করতে অগ্রসর হন এবং শোভাযাত্রার সর্বাগ্রে ভক্তগণ হিন্দুধর্মের ত্রিশূল ও ওঁকার, বৌদ্ধধর্মের ত্রিশরণ, ইসলামধর্মের অর্ধচন্দ্র এবং খৃষ্টান ধর্মের ক্রশ চিহ্নিত প্রতীকগুলি বহন করেন।

সন্ধ্যার পূর্বেই শবযাত্রা কাশীপুর মহাশ্মশানে উপনীত হয়।

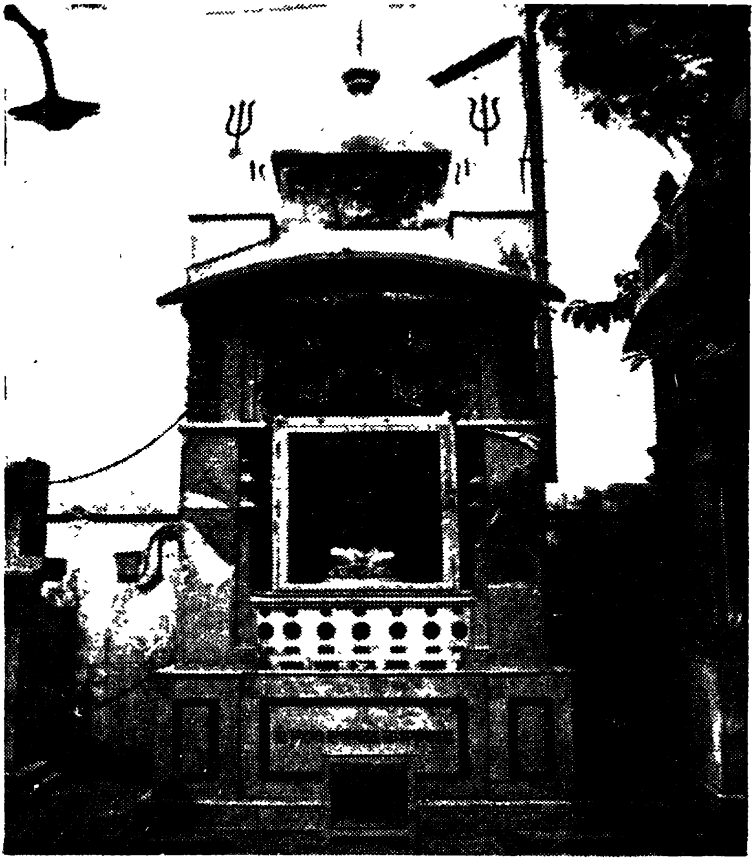
(প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, কাশীপুর উদ্যানবাটী থেকে প্রায় এক মাইল উত্তরে,—, গঙ্গার পূর্বতীরে এই মহাশ্মশান। গঙ্গার পশ্চিমতীরে, অর্থাৎ বিপরীত অপর পারে বর্তমানে প্রখ্যাত বেলুড় মঠ। পূর্বে এই শ্মশানটি নড়াইলের জমিদারদের অধীনে ছিল এবং সেই সময়েই ঠাকুরের নশ্বর দেহের আহুতি ও শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় এই মহাশ্মশানে। পরবর্তীকালে, পুরসভার অধীনে আসার পর, ঠাকুরের শেষ স্মৃতিবাহী এই শ্মশানের নামকরণ হয়—'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মহাশ্মশান'। শ্মশানের উত্তর-পশ্চিমপ্রান্তে যে স্থানে ঠাকুরের দেহকে আহুতি দেওয়া হয়েছিল, সেখানে বর্তমানে একটি সমাধিমন্দির স্থাপিত হয়েছে এবং মন্দিরের শীর্ষে ওঁ চিহ্ন ও চারপাশে চারটি ত্রিশূল ছাড়াও সম্মুখের শীর্ষদেশে ইসলামধর্মের 'চাঁদ-তারা' ও খৃষ্টানধর্মের 'ক্রশ' চিহ্ন শোভা পাচ্ছে। সমাধি-মন্দিরের গায়ে লেখা আছে—'ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়'। উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত সমাধিবেদীর ওপর ঠাকুরের একটি মাঝারি ধরণের শ্বেত-প্রস্তরমূর্তি স্থাপিত হয়েছে এবং সেখানে নিত্য পূজা ও আরতির ব্যবস্থা আছে। এটির দক্ষিণে পৃথক একটি স্মারকবেদীর ওপরে ঠাকুর, মাষ্টারমশাই শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, স্বামী অভেদানন্দ ও শ্রীশ্রীগৌরী-মা'র ছবি শোভা পাচ্ছে এবং বেদীর গাত্রে 'কাশীপুর মহাশ্মশান তীর্থ বন্দনা' কবিতার মাধ্যমে জনৈক সাধুভক্তের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদিত হয়েছে। ঠাকুরের সমাধিমন্দিরের দক্ষিণে গৃহীভক্ত শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (কথামৃতকার) এবং উত্তরে ত্যাগীভক্ত স্বামী অভেদানন্দের সমাধিমন্দির। এ ছাড়াও এই শ্মশানে ঠাকুরের সন্ন্যাসিনী শিষ্যা গৌরী-মা, শ্রীশ্রীসারদা দেবীর অন্যতম শিষ্য জঙ্গলী বাবা স্বামী কৃষ্ণানন্দের সমাধিবেদীও স্থাপিত আছে। এইভাবে এই শ্মশানটি আজ সত্যই এক মহাতীর্থ! অন্যান্যদের মধ্যে নটগুরু শিশিরকুমার ভাদুড়ী (মূর্তিসহ) এবং বিপ্লবী খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিবেদীও এখানে রক্ষিত আছে। ঠাকুরের স্মৃতিবাহী, শোক-দুঃখের অতীত এক অনুপম

করুণাভূমি এই কাশীপুরের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মহাশ্মশানের ঠিকানা :—৫, চন্দ্রকুমার রায় লেন, কলিকাতা—২। উত্তর কলকাতার বরাহনগর বাজারের অদূরে দক্ষিণ দিকে কাশীপুর রোডের ওপর—'নর্থ সুবারবান হাসপাতাল'; এই হাসপাতালের বিপরীতদিকে পশ্চিমমুখী রাস্তা 'রতনবাবু রোড' ধ'রে গেলে, বামদিকে গঙ্গার উপকূলে এই 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মহাশ্মশান'। বরাহনগর বাজারের পাশ দিয়ে পরামাণিক ঘাট রোড দিয়েও এখানে আসা যায়। ভক্তদের জ্ঞাতার্থে শ্মশানের পরিচিতি প্রকাশিত হ'ল।

*　　　*　　　*

কাশীপুর মহাশ্মশানে ঠাকুরের শবদেহ আনার পর, শ্মশানঘাট শবদেহবাহী খাটটি স্থাপন ক'রে, ঠাকুরের দেহ প্রদক্ষিণপূর্বক সেখানে কিছুক্ষণ সঙ্কীর্তন হয়। চিতা প্রস্তুত;—শবদেহ খাট থেকে নামিয়ে গঙ্গাজলে ধৌত করার পর, চিতায় স্থাপন করা হয় এবং একে একে সকল ভক্ত ঠাকুরের চরণ স্পর্শ ক'রে শেষবারের মত প্রণতি জানান। এই সময় ঠাকুরের নেত্রদ্বয় ঈষদুন্মীলিত ও মুখমণ্ডল ঈষৎ হাস্যযুক্ত থাকায় সকলের ধারণা হয় যে, সম্ভবতঃ সমাধি অবস্থাতেই ঠাকুর দেহত্যাগ করেছেন। অতঃপর ঘৃত, চন্দন, কাষ্ঠ, মাল্য প্রভৃতি দ্বারা সজ্জিত চিতার উপর শায়িত ঠাকুরের মুখাগ্নি করেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীরামলাল; অনুগত শিষ্যগণ একে একে সকলেই পুত্রবৎ সেই ধর্মপিতার দেহে অগ্নি প্রদান করেন এবং ব্রাহ্মভক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ঠাকুরের প্রিয় কয়েকটি সময়োপযোগী সঙ্গীত পরিবেশন ক'রে অন্তরের শেষ ভক্তিঅর্ঘ্য নিবেদন করেন। এই সময় গুরুগতপ্রাণ শশীভূষণ (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) ঠাকুরের দেহ আগুনের উত্তাপ থেকে রক্ষার জন্য সরল বালকের মত চিতার ওপরেই তালপাতার পাখা দিয়ে বাতাস করতে থাকেন। আবার, আজীবন ঠাকুরের অনুগতভক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (পরবর্তীকালে বসুমতী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা) ঠাকুরের দেহত্যাগের সংবাদে কাশীপুর শ্মশানে উন্মাদের মত যাওয়ার সময় এক বিষধর সর্প তাঁর পায়ে দংশন করে; কিন্তু শ্মশানের উপস্থিত ভক্তবৃন্দ তপ্ত লৌহশলাকা দিয়ে ক্ষতস্থানটি পুড়িয়ে দিলে, তিনি সে যাত্রায় রক্ষা পান।

একঘণ্টার মধ্যেই ঘৃত ও চন্দনকাষ্ঠ সমুৎপন্ন প্রজ্বলিত চিতাগ্নি ঠাকুরের পবিত্র দেহটিকে ভস্মীভূত করে। চিতানল যখন পূর্ণরূপে প্রজ্বলিত, ঠিক সেই সময় আকাশ থেকে আবার অকস্মাৎ গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি চিতার ওপর ঝরে পড়তে থাকে। দাহকার্য শেষে শোকসন্তপ্ত ভক্তগণ ঠাকুরের দিব্যাস্থির কিছু অংশ গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দিয়ে, নরেন্দ্রনাথের তথা স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশে সকলে কিছু কিছু



শ্রীরামকৃষ্ণ মহাশ্মশান

অংশ নিজ নিজ বাড়িতে পূজার জন্য সংগ্রহ করেন এবং অবশিষ্ট অংশ ও চিতাভস্ম সযত্নে একটি তাম্রের পাত্রে রক্ষিত ক'রে 'জয় রামকৃষ্ণ' ধ্বনি দিতে দিতে শূন্যমনে ও শূন্যপ্রাণে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে ফিরে এসে ঠাকুরের শূন্যশয্যার উপর সেটি স্থাপন করেন। এ সম্পর্কে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল রচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত'-গ্রন্থে উল্লেখ আছে :—"যজ্ঞ সমাপনে ভক্তগণের পরমনিধি প্রভুর পবিত্র দেহাংশেষ সঞ্চয় করা হয়। জগত্তারণ বাসনায় দ্রব হইয়া যিনি গঙ্গারূপে প্রবাহিত, সেই পুণ্যনীরে নারায়ণাস্থির কথঞ্চিৎ নিমজ্জিত করিয়া মনে হয় স্বর্ণদী জীবমালিন্যমুক্ত হইয়া যেন পুণ্যতরা হইলেন। কিন্তু কি জানি কোন প্রেরণায় অথবা প্রজ্ঞান আলোকে, সন্তানশ্রেষ্ঠ নরেন্দ্রনাথ শুভমিশ্র অশুভ আশঙ্কায় কহেন—সমস্তই পাত্রে রক্ষা না করিয়া দিব্যাস্থির কিঞ্চিদংশ স্ব স্ব গৃহে রাখিয়া অর্চনা করিও।···ভক্তগণ ভগ্নহৃদয়ে উদ্যানে ফিরিয়া শিরোধৃত পুণ্যাস্থি প্রভুর শয্যায় রক্ষা করেন।"

(প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পরবর্তীকালে এই ভস্মাবশেষ ও দিব্যাস্থির কিছু অংশ কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানে এবং বাকী অংশ বেলুড় মঠে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের মাধ্যমে উভয় স্থানেই মঠ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়।)

ঠাকুরের এই দিব্যাস্থির বিষয়ে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে যে ঘটনা ঘটে, সে সম্পর্কে জানা যায় যে, ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানেরা যখন শোনেন যে, গৃহীভক্ত রামচন্দ্র দত্ত ঠাকুরের অস্থি ভস্মাদি কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানে সমাহিত করবেন, তখন তাঁরা তাম্রকলস থেকে গোপনে অর্ধেকেরও বেশী ভস্মাবশেষ ও অস্থিনিচয় বার ক'রে বাগবাজারে ভক্ত বলরাম বসুর বাড়িতে নিত্য পূজার জন্য পাঠিয়ে দেন, যা পরবর্তীকালে বেলুড় মঠে রক্ষিত হয়; বাকী অংশ রামচন্দ্র দত্ত কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানে রক্ষা ক'রেছিলেন। কিন্তু এই পূতাস্থি ভাগাভাগির পর যে বিশেষ ঘটনাটি ঘটে, সে সম্পর্কে স্বামী অভেদানন্দ তাঁর রচিত 'আমার জীবনকথা'-গ্রন্থে উল্লেখ ক'রেছেন :—

"নরেন্দ্রনাথ বলিল, 'ত্মাখো, আমাদের শরীরই শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন্ত সমাধিস্থান। এসো, আমরা সকলে তাঁর পবিত্র দেহের ভস্ম একটু ক'রে খাই ও পবিত্র হই।' নরেন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম কলসী হইতে সামান্য অস্থির গুঁড়া ও ভস্ম গ্রহণ করিয়া 'জয় রামকৃষ্ণ' বলিয়া ভক্ষণ করিল। তাহার পর আমরা সকলেই তাহাকে অনুসরণ করিয়া নিজেদের ধন্য জ্ঞান করিলাম।"

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নরেন্দ্রনাথের নির্দেশে শ্মশানেই অনেকে ঠাকুরের অস্থি ও ভস্মাবশেষ সংগ্রহ ক'রে নিয়ে যান নিজ নিজ বাড়িতে অর্চনার জন্য। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের নিজের সংগৃহীত সেই অস্থি অসাবধানতাবশতঃ তাঁর

নিজের বাড়িতেই নষ্ট হয়। হয়তো ঠাকুরের ইচ্ছাতেই এমন ঘটনা ঘটে! এ সম্পর্কে তাঁর কনিষ্ঠভ্রাতা ডঃ ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর রচিত 'স্বামী বিবেকানন্দ'-গ্রন্থে উল্লেখ ক'রেছেন :—"শ্রীরামকৃষ্ণের দেহরক্ষার পর নরেন্দ্রনাথ বাড়ি ফিরে এলেন এবং জামাকাপড় ধুতে দিলেন। পরের দিন তিনি মাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তিনি তাঁর চাদরে অস্থি পেয়েছেন কিনা। মা বললেন, 'চাদরের কোণে কতকগুলো কয়লার ছাই দেখে ফেলে দিয়েছি।' তিনি বললেন, 'হায়! হায়! ও-গুলোইতো ছিল রামকৃষ্ণের অস্থি'!"

*　　*　　*

এইবার একটিমাত্র অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ ক'রে, ঠাকুরের অন্তলীলাকাহিনী শেষ করব। ঘটনাটি ঠাকুরের মহাপ্রয়াণের দিনই কাশীপুরে ঘটেছিল। স্বামী অভেদানন্দ তাঁর রচিত 'আমার জীবনকথা'-গ্রন্থে এই অলৌকিক ঘটনা প্রসঙ্গে বলেছেন :—"শ্রীশ্রীঠাকুর যেইদিন মহাসমাধিতে মগ্ন হন (৩১শে শ্রাবণ, ১২৯৩), সেইদিন একটি আশ্চর্য ঘটনা সংঘটিত হইল। শ্রীশ্রীঠাকুরের অদর্শনে শ্রীমা প্রায় সংজ্ঞাহারা। তিনি আপনার ঘরে শোকাতুরা হইয়া সধবার চিহ্নস্বরূপ দুই হস্তের সোনার বালা ইত্যাদি খুলিয়া ফেলিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু ঘটনা ঘটিল অন্য-রকম। শ্রীমা যখন হস্তের বালা ইত্যাদি খুলিতে উদ্যত হইলেন, তখন তিনি চাক্ষুষভাবে প্রত্যক্ষ করিলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুর স্থূল শরীরে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে হস্তের বালা খুলিতে নিষেধ করিতেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমার দুইটি হস্ত ধরিয়া বলিলেন, 'আমি কি কোথাও গেছি গা? এই যেমন এ-ঘর থেকে ও-ঘর।' শ্রীমা শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া এবং তাঁহার শ্রীমুখের অভয়বাণী শুনিয়াও হাতের বালা ও কপালের সিন্দুর সেইসঙ্গে মুছিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাহা পাড়িলেন না। শ্রীমা ভালভাবেই বুঝলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের পার্থিব শরীরই শুধু নষ্ট হইয়াছে, কিন্তু দিব্যশরীরে তিনি সর্বদাই বিদ্যমান আছেন ও থাকিবেন। তখন হইতে তিনি যেমন লালপেড়ে কাপড় পরিতেন, তাহাই পরিতে লাগিলেন। তবে লাল নরুণ পেড়ে কাপড়ই তিনি পরিতে লাগিলেন।"

*　　*　　*

এইভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলার অবসান! যাঁর কৃপালাভের জন্য জগৎশুদ্ধ লোক পাগল,—যাঁর কথামৃতপানে আপামর জনসাধারণ পরিতৃপ্ত,—যাঁকে দর্শন করলে প্রাণের গভীরে শ্রদ্ধাভক্তির উদয়,—যাঁকে স্পর্শ করলে জীবনে শাশ্বত শক্তির সঞ্চার,—যাঁর সান্নিধ্যে এলে লজ্জা-ঘৃণা-ভয় দূরীভূত,—যিনি অসুস্থ শরীরেও বরাভয় মূর্তিতে ভক্তদের কৃপা করতে উদ্যত,—যিনি কল্পতরুরূপে চৈতন্যদানকারী,—

যিনি ইহলোকের আশ্রয়, পরলোকের সহায়,—যিনি দুর্বলের বল, হতাশার প্রাণের আশ্বাস,—যিনি ভীতচিত্তের অভয়, চরম শোকের পরম সান্ত্বনা,—যিনি নৈরাশ্যে উদ্দীপনা, আনন্দে পুলক-শিহরণ,—যিনি মুমূর্ষুর সঞ্জীবনী, সর্বস্বান্তের সর্বস্ব,—যিনি অপূর্ণের পূর্ণ, শূন্যের ষোলআনা,—যিনি পরমপিতা, আবার পরমমাতা,—যিনি সুখের প্রভাত, আবার দুখরাত্রির অবসান,—যাঁর কণ্ঠস্বরে দিব্যবীণার সুর ঝঙ্কৃত,—সেই কণ্ঠস্বর আজ নীরব! স্থূলজগৎ থেকে রামকৃষ্ণ-বিগ্রহ আজ অন্তর্হিত! একথা স্মরণ করতেও মন নিগৃহীত হয়, চিত্তবৃত্তিতরঙ্গ নিশ্চল হয়! তবু ভক্ত সেই সর্বত্রগামী সর্বাত্মার স্থূলজগতের শেষ স্মৃতি মন্থন ক'রে বিরহানন্দ উপভোগ করে!

ঠাকুর বলতেন, ভগবান যখন নররূপে অবতীর্ণ হন, তখন মানুষের মতই সব আচরণ করেন, মানুষের মতই সুখ-দুঃখ-ব্যাধি ভোগ করেন, আবার মানুষের মতই ইহলোক ত্যাগ করেন। যীশুখৃষ্ট ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় দেহত্যাগ করেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চরণে তীরবিদ্ধ অবস্থায় দেহত্যাগ ক'রেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণও কণ্ঠে ক্যান্সারবিদ্ধ অবস্থায় দেহত্যাগ করলেন। সকল ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যতা প্রমাণ, সকল মতের সাধনপথে দুর্জয় শক্তি সঞ্চার, ধর্মে ধর্মে পারস্পরিক বিবাদ-ভঞ্জন ও সর্বভাব সমন্বিত যুগধর্ম স্থাপনের জন্য দেহ ধারণ করলেন তিনি,—আবার সকলের অক্ষমতা ও গ্লানির ভোগ নিজদেহে গ্রহণ ক'রে দেহবিসর্জনও দিলেন তিনি লীলা-মাধুর্যে সকলের মনোহরণ ক'রে। ঈশ্বরতত্ত্ব সত্যই দুর্বোধ্য,—আবার ঈশ্বরের নরলীলা আরও দুর্বোধ্য!

সেদিনের সেই কাশীপুর মহাশ্মশানের চিতা থেকে যে অগ্নি ধূ ধূ প্রজ্বলিত হ'ল, তারই ভাব-শিখা বহন ক'রে শতসহস্র জীবনদীপ আজ আলোকিত,—দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ঘনান্ধকার আজ দূরীভূত! বহির্জগতের লীলা সঙ্গে ক'রে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এখন জীবকুলের অন্তর্জগতে লীলা ক'রে চলেছেন! এ লীলা আরো মধুর, এ লীলার শেষ নেই, এ লীলা চিরন্তন! সেখানে তিনি নিত্য স্মরিত, নিত্য বন্দিত, নিত্য পূজিত! বিশ্বকবির ভাষায় তাই ভক্তের আকূতি—

'হে মহাজীবন, হে মহামরণ,
লইনু শরণ, লইনু শরণ।'

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

—সহায়ক গ্রন্থাবলী—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ (১-৫ খণ্ড)— স্বামী সারদানন্দ

আমার জীবনকথা— স্বামী অভেদানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (১-৫ ভাগ)— শ্রীম-কথিত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত— শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত— শ্রীরামচন্দ্র দত্ত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি— শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন

শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা— শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ— শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী

শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজির জীবনের ঘটনাবলী (১ম খণ্ড)— শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

স্বামী বিবেকানন্দ— ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা (১-২ খণ্ড)— স্বামী গম্ভীরানন্দ

আনন্দরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ— স্বামী প্রভানন্দ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ— ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য

শ্রীরামকৃষ্ণ (সমসাময়িক দৃষ্টিতে)— শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস সম্পাদিত

অবতার-তত্ত্ব— স্বামী দয়ানন্দ (শ্রীভারতধর্ম মহামণ্ডল, কাশীধাম)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংস্পর্শে (দে'জ পাবলিশিং)— শ্রীনির্মলকুমার রায়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তীর্থপরিক্রমা (নবভারতী প্রকাশনী)— শ্রীনির্মলকুমার রায়